ইসলামের উপর প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের

নয় হামলা

শায়খ ড. মুসতফা আস-সিবায়ি রহ.

শামসুদ্দিন ইবনে সাআদ উদ্দিন

অনূদিত

সূচিপত্র

অনুবাদকের বিশ্লেষণমূলক ভূমিকা ■ ১৫
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের পরিচয় ■ ১৫
শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ ■ ১৫ مستشرق ও إستشراق
শব্দের পারিভাষিক বিশ্লেষণ ■ ১৬ مستشرق ও إستشراق
প্রথম সংজ্ঞা ■ ১৬
দ্বিতীয় সংজ্ঞা ■ ১৬
তৃতীয় সংজ্ঞা ■ ১৭
চতুর্থ সংজ্ঞা ■ ১৭
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের অধ্যপনার সূচনা ■ ১৭
আল্লামা মুসতফা মুরাদ-এর অভিমত ■ ১৭
প্রথম প্রাচ্যীয় অধ্যাপক ■ ১৮
প্রাচ্যবিদদের ইসলামি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ■ ১৮
য়খ আবদুল মালিক দামাত বারাকাতুহুম-এর প্রদেয় সংজ্ঞা ■ ১৯
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর দৃষ্টিতে
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের লক্ষ-উদ্দেশ্য ■ ১৯
প্রাচ্যবিদদের লক্ষ-উদ্দেশ্যের তিনটি পয়েন্ট ■ ২০
আলোচনার সারসংক্ষেপ ■ ২০
যুগ সচেতন আলেম মুসতফা আস-সিবায়ি রহ. ■ ২১
প্রাচ্যবিদগণের উক্তি ■ ২১
ওরিয়েন্টালিস্টদের বিষোদগার উক্তি ■ ২৪
আল-কুরআনুল কারিমের ব্যাপারে মিথ্যাচার ■ ২৪
রাসুল ও হাদিস সম্পর্কে মিথ্যাচার ■ ২৫
ইসলামি যুদ্ধ, বিজয় ও শাসন ■ ২৭
ইসলামি খিলাফতব্যবস্থা ■ ২৮
রাসুলের সাহাবিদের প্রতি বিষোদ্গার ■ ২৯
ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার ■ ২৯
কেন উক্তিগুলো সংকলন করলাম? ■ ৩০

ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রশংসনীয় উক্তি ■ ৩১
ওরিয়েন্টালিস্টদের দেশ পরিচয় ■ ৪১
১. ইংল্যান্ড/ব্রিটেন ■ ৪১
২. আমেরিকা ■ ৪১
৩. ফ্রান্স ■ ৪১
৪. জার্মান ■ ৪২
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশে ওরিয়েন্টালিস্ট ■ ৪২
ধর্মভিত্তিক ওরিয়েন্টালিজম ■ ৪২
মুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট ■ ৪৩
ওরিয়েন্টালিস্টদের বিভ্রান্তির কারণ ■ ৪৪
প্রথম শ্রেণির গবেষণা ও গবেষক ■ ৪৫
প্রথম ধাপ : মিশনারি তৎপরতা ■ ৪৫
দ্বিতীয় ধাপ : খ্রিস্টানদের পরিচালনায় মাদরাসা ■ ৪৫
তৃতীয় ধাপ : আধুনিক ওরিয়েন্টাল সিস্টেম ■ ৪৬
১. ইসলামি স্টাডি ও বিষোদ্গার ■ ৪৭
২. ইসলামি পাণ্ডুলিপি পাচার ■ ৪৭
৩. ইসলামি স্টাডির নামে ফ্যাকালটি খোলা ■ ৪৭
৪. ইসলামি দেশে প্রফেসর ও গবেষক হিসাবে নিয়োগ লাভ ■ ৪৮
দ্বিতীয় শ্রেণির গবেষণা ও গবেষক ■ ৪৯
ওরিয়েন্টালিস্টদের বিষয় ভিত্তিক গবেষণা ■ ৫১
বিভ্রান্তিকর গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি প্রদান শিক্ষাগত অপরাধ ■ ৫২
এই বইয়ে উল্লিখিত ওরিয়েন্টালিস্টেদের বিবরণ ■ ৫২
আরো কিছু ওরিয়েন্টালিস্ট ■ ৫৪
ওরিয়েন্টালিজমের ব্যাপারে মিসর ইফতাবোর্ডের নির্দেশনা
১. শক্তভাবে তাদের মুখামুখী হওয়া ■ ৫৫
সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য করণীয় ■ ৫৬
পাঠকের সহায়ক গ্রন্থাবলি ■ ৫৭
আরবি গ্রন্থের প্রকাশকের বক্তব্য ■ ৬১
গ্রন্থকারের ভূমিকা ■ ৬৫
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের প্রতি উদার দৃষ্টি ঠিক নয় ■ ৬৫

ড. তহা হোসাইন ও তার চিন্তাগত দাসত্ব ■ ৬৮
অধ্যাপক আহমদ আমিন ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ■ ৬৮
ড. আবদুল কাদির ও গোল্ড যিহার ■ ৬৯
জার্মানে অধ্যয়নকালে ইসলাম বুঝেছেন ■ ৭০
ইমাম যুহরি জাল হাদিস তৈরি করতেন ■ ৭১
হিদায়া ইসলামিয়া পরিষদের সভা
ও ড. আবদুল কাদিরের ভুল স্বীকার ■ ৭২
প্রাচ্যের অধ্যাপকদের ব্যাপারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত ■ ৭৩
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক সীমালঙ্ঘনের নামান্তর ■ ৭৪
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ইতিহাস ■ ৭৬
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের কর্মক্ষেত্র ■ ৭৭
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণার কারণ ■ ৭৮
১. ধর্মীয় কারণ ■ ৭৮
২. ঔপনিবেশিক কারণ ■ ৮০
৩. অর্থনৈতিক কারণ ■ ৮১
৪. রাজনৈতিক কারণ ■ ৮১
৫. শিক্ষাগত কারণ ■ ৮২
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণার লক্ষ ও মাধ্যম ■ ৮৩
ক. সন্দেহপূর্ণ বিকৃত গবেষণা প্রকাশ ■ ৮৩
প্রথমত : নবিজির নবুওয়াত অস্বীকার ■ ৮৩
দ্বিতীয়ত : ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয় ■ ৮৪
তৃতীয়ত : হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা ■ ৮৫
চতুর্থত : ইসলামি আইনের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা ■ ৮৬
পঞ্চমত : আরবিভাষার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা ■ ৮৬
খ. ধর্মীয় ও রাজনৈতিক লক্ষ-উদ্দেশ্য ■ ৮৭
এক. মৌলিক বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করা ■ ৮৭
দুই. মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা
এবং সন্দেহের বেড়াজাল সৃষ্টি করা ■ ৮৭
তিন. মুসলিমদের গবেষণালব্ধ রচনার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা ■ ৮৮

চার. ইসলাম-পূর্ব জাতীয়তাবাদ ও গোত্রীয় বিদ্বেষ পুনর্জ্জীবিত করা ■ ৮৮
গ. পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক একনিষ্ঠ গবেষণা ■ ৮৮
টার্গেট বাস্তবায়নে যে মাধ্যমগুলো ব্যবহারিত হয় ■ ৯০
১. বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ ■ ৯০
২. পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ■ ৯০
৩. মিশনারি প্রেরণ ■ ৯০
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক সেমিনার ■ ৯১
৫. নামি-দামি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রেরণ ■ ৯১
৬. কনফারেন্সের আয়োজন ■ ৯২
৭. তথাকথিত বিশ্বকোষ ■ ৯২
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ-পত্রিকা পরিচিতি ■ ৯৩
প্রকাশিত ম্যাগাজিন ■ ৯৩
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ ও তাদের বিভ্রান্তিকর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ■ ৯৫
এ. জে. আরবেরি A. J. Arberry ■ ৯৫
ইসলাম বিষয়ক তার রচনাবলি ■ ৯৫
এ. জিওম A. Geom ■ ৯৬
ব্যারন কারা ডি ভাক্স Baron Carra De Vaux ■ ৯৬
এইচ. এ. আর. গিব H.A.R. Gribb ■ ৯৬
হাঙ্গেরির অধিবাসী Gold Zihe৯ ■ ৬৭
জন মায়নার্ড Jon Maynard ■ ৯৮
এস. এম. জুইমার M. Zweimer ■ ৯৮
আযিয আতিয়া সুরইয়াল ■ ৯৯
জি. ভন. গ্রানবাউম G. Von Grunbaum ■ ৯৯
পি. এইচ. হিট্টি P.h. Hitti ■ ১০০
এ. জে. ওয়াসিংক A.J. Wensink ■ ১০১
কে. ক্র্যাজ K. Cragg ■ ১০২
এল. ম্যাসিগনন L. Massignon ■ ১০২
ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড D. B. Macdonald ■ ১০৩
এম গ্রিন M. Green ■ ১০৪

মাজিদ কুদুরি ■ ১০৪
ডে. এস. মার্গালিউথ D. S. Margoliouth ■ ১০৫
আর. এ. লিকলসন R. A. Nickolson ■ ১০৫
'হারফলি হুল ■ ১০৬
এইচ লামেন্স H. Lammens ■ ১০৬
জে স্কচট(সাচট) J. Schacht ■ ১০৭
'প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের আপত্তিকর কিছু বই ■ ১০৭
ক. ইসলামি বিশ্বকোষ ■ ১০৮
খ. আরব ও ইসলাম সংক্রান্ত আলোচনা ■ ১০৮
A. Toynbee এর ইসলাম ও রাসুল সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ ■ ১০৮
প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণার মাপকাঠি ■ ১১১
হাদিস তৃতীয় হিজরি শতকে সৃষ্ট ■ ১১২
ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ ■ ১১২
ইমাম যুহরি জাল হাদিস তৈরি করতেন ■ ১১৫
আরবরা (ইসলাম) প্রজাদের পশুপাল মনে করে ■ ১১৬
গোল্ড যিহারের আপত্তির জবাব ■ ১১৭
ইবনে হাজার আসকালানির ব্যাখ্যা ■ ১১৮
নবিজি কুরআন-হাদিস সাহিত্যের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন ■ ১২০
প্রত্যেক দেশেই কিছু আঞ্চলিক ভিন্নতা রয়েছে ■ ১২১
ইউরোপে প্রাচ্যবিদদের মুখামুখি ■ ১২৩
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (London University) ■ ১২৪
স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়
(University of Edinburgh) ■ ১২৫
স্কটল্যান্ডের গ্লাসকো বিশ্ববিদ্যালয় (University of Glasgow) ■ ১২৫
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Oxford University) ■ ১২৬
ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়
(University of Cambridge in England) ■ ১২৬
ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়
(University of Manchehter in England) ■ ১২৭

ল্যাডিন ভার্সিটি (Leiden University) ■ ১২৭
আবসালা ইউনিভার্সিটি (University of Uppsala) ■ ১২৯
আরো কিছু ইউনিভার্সিটি ■ ১৩০
দীর্ঘ ভ্রমণে যা অর্জিত হল ■ ১৩০
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ■ ১৩৩
আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতায় শীর্ষে ■ ১৩৩
প্রাচ্যবিদদের ব্যাপারে আমার শেষ কথা ■ ১৩৪
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে আমাদের মিশ্রণ ■ ১৩৭
আমাদের শিক্ষাবিদ ও সুসভ্য ব্যক্তিবর্গ ■ ১৩৮
আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ■ ১৩৯
এখনই সময় স্বকীয়তা ও উন্নত চেতনা তৈরীর ■ ১৪১

ইসলামের উপর প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের
নগ্ন হামলা

অনুবাদকের বিশ্লেষণমূলক ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের পরিচয়

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের সকল প্রকার খারাপ ও পাপ কাজ হতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথহারা করতে পারবে না এবং তিনি যাকে পথহারা করবেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারবে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও সর্বশেষ রাসুল।

إستشراق ও مستشرق শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ

আরবি ভাষায় প্রাচ্যীয় পণ্ডিত নামকরণ করা হয়েছে مستشرق করে। এর বহুবচন مستشرقون। এ শব্দটির উৎপত্তি استشراق শব্দ থেকে, যার মূল হলো شرق .

আর شرق শব্দের সাধারণ অর্থ পূর্ব, পুব, প্রাচ্য, প্রাচ্যদেশ, প্রাচ্যজগৎ, সূর্য উদিত হওয়ার স্থান, পূর্বাঞ্চল প্রভৃতি।[১] আর সেখান থেকে এসেছে

---

১. মুহিত ফিল লুগাহ- ১/১৬২, আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান-৪৯৩, রিয়াদ প্রকাশনী।

إستشراق শব্দটি। যার আভিধানিক অর্থ হলো, প্রাচ্যবিশারদ হওয়া, প্রাচ্যবিদ হওয়া, প্রাচ্যদেশীয় হওয়া ও প্রাচ্যদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা প্রভৃতি।[২]

আর مستشرق এটি বিশেষ্য হিসাবে অর্থ হলো প্রাচ্যবিদ, প্রাচ্যীয় পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিশারদ প্রভৃতি। আর ইংরেজিতে Orientalist বলা হয়।

إستشراق ও مستشرق শব্দের পারিভাষিক বিশ্লেষণ

প্রথম সংজ্ঞা

ইসলামি বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের ভাষায় إستشراق বলা হয়, প্রাচ্য ও প্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞান অর্জনের প্রয়াসকে।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা

এ সম্পর্কে অধ্যাপক সালিম মুবারক আল ফালাক তার : اللغة العربية و المواجهة ১/১৯ গ্রন্থে বলেন,

أن تعريف الاستشراق مجملاً وهو دراسات وأبحاث قام بها غربيون

'সমষ্টিগতভাবে إستشراق বলা হয় বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা (High studis) ও পর্যালোচনা, যা পাশ্চাত্য মনীষীগণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

অধ্যাপক সালিম মুবারক إستشراق এর ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে একই গ্রন্থে বলেন,

تهدف إلى دراسة العالم الشرقي ولاسيما الإسلامي، ديناً وتاريخياً وحضارة وعادات وشعوباً، بهدف فهم حقيقة الإسلام

'প্রাচ্য জগত (ইসলামি, ইসলামি রাষ্ট্র) নিয়ে বিশেষ গবেষণার আসল লক্ষ হলো, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস, সভ্যতা, ফিতরাত, স্বভাব ও জাতীয়তা প্রভৃতি অন্তর্গত। তারা এসব পর্যালোচনা করে ইসলামের হাকিকত ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে চান।[৩]

---

২. আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পৃ. ৬১, রিয়াদ প্রকাশনী; আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পৃ. ৬৮।

৩. আল-লুগাহ আল-আরাবিয়া, আত-তাহদিদ ওয়াল মুয়াজাহা ১/১৯।

তৃতীয় সংজ্ঞা

কেউ কেউ প্রাচ্যবাদের সংজ্ঞা করেছেন– মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অমুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হচ্ছে প্রাচ্যবাদ। প্রাচ্যবিদ মানেই ইউরোপীয় এমন নয়। তিনি প্রাচ্যের একজন হতে পারেন। বস্তুত মুসলিম নন, কিন্তু মুসলিমদের জ্ঞানরাজ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিমাত্রই প্রাচ্যবিদ। যেমন: মিসরি খ্রিস্টান আযিয আতিয়া সুরইয়াল, লেবাননি খ্রিস্টান পি. এইচ হিট্টি ও ইরাকি খ্রিস্টান মাজিদ আল-কুদুরি প্রমুখ। এসব লোক আরব ও ইসলামি দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন।

চতুর্থ সংজ্ঞা

অন্যরা বলেন, প্রাচ্যকে পাঠ, ব্যাখ্যা, পুনর্গঠন ও তার উপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ক্ষমতা খাটানোর বিশেষ প্রকল্পের নাম প্রাচ্যবাদ।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের অধ্যাপনার সূচনা

অধ্যাপক সালিম মুবারক এই ইসতিশরাকী অধ্যাপনার সূচনা সম্পর্কে বলেন,

وقد نشأت منذ أكثر من ألف سنة في العالم الغربي، ومازالت موجودة حتى يومنا هذا

পাশ্চাত্য বিশ্বের এক হাজার বছরেরও অনেক আগে থেকেই এই প্রাচ্যীয় অধ্যয়নের সূচনা হয়েছে। আর আমাদের পর্যন্ত এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

আল্লামা মুসতফা মুরাদ-এর অভিমত

এই বইয়ে আল্লামা মুসতফা আস-সিবায়ি রহ. বলেন, সুনির্দিষ্টভাবে কেউ জানে না সর্বপ্রথম প্রাচ্যের কোন্ লোকটি ইসলামি বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং এ-ও জানা নেই, তা কোন্ সময়ে শুরু হয়েছিল। তবে এ কথা তো জোর দিয়ে বলা যায়– কতিপয় পশ্চিমা ধর্মযাজক স্পেনের গৌরবময় সোনালি যুগে সেখানে আসেন। তখনকার সে-সব মাদরাসায় তারা সু-শিক্ষা, সভ্যতার জ্ঞান লাভ করেন। তারা কুরআনুল

কারিম ও ধর্মীয় অনেক গ্রন্থ নিজ ভাষায় অনুবাদ করেন। তারা মুসলিম বিদগ্ধ আলেমদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ শাখার অন্যতম হলো দর্শন, চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্র।

প্রথম প্রাচ্যীয় অধ্যাপক

তাদের প্রথম ব্যক্তি হলেন ফ্রান্সের Jerbert। যিনি ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে অবস্থান করার জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করেন। তিনি স্পেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীতে নিজ দেশে ফিরে যান। Pierrele Aènèrè ১০৯২-১১৫৬ এবং Gèrard de Grèmone ১১১৪-১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে আসেন।

তারা নিজ দেশে ফিরে যাবার পর আরব সভ্যতার ও আরব মহাজ্ঞানী আলেমদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের প্রচার প্রসার করতে থাকেন। তারপর তারা আরবদের মাদরাসার মতো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রস্তর করেন। বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র আর একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা আরবদের গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে পাঠদান শুরু করলেন।

তখনকার সময় ল্যাটিন ভাষায়ই ছিল ইউরোপের একমাত্র ভাষা। প্রাচ্যীয় তৎকালীন ভার্সিটিগুলো আরবদের গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে স্থায়ীত্ব পেয়ে গেল। ছয় শতাব্দি পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য আরবি গ্রন্থগুলোই উৎসমূল হিসেবে পরিগণিত হত।

এ দীর্ঘ সময় এমন কোন মুহূর্ত অতিবাহিত হয়নি, যখন মানুষ ইসলাম, আরবিভাষা, কুরআন অনুবাদ, কতিপয় গবেষণালব্ধ আরবিগ্রন্থ ও সাহিত্যের বই পাঠ গ্রহণ করেনি।

প্রাচ্যবিদদের ইসলামি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ

এভাবে চলে আসে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। এসময় ইসলামি বিশ্বের উপর ইউরোপ ও পাশ্চাত্য গোষ্ঠী ঔপনিবেশিকতার ও সম্পদ-সম্পত্তির উপর আগ্রাসন সূচনা করে। তখন পাশ্চাত্যের বড় এক জামাত ইসলামি বিষয়গুলো অধ্যয়নে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে। এ লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। আরবি ও ইসলামি

দেশগুলোর আরবি পাণ্ডুলিপিগুলোতে (مخطوطات) তারা পরিবর্তন সাধন করেন। অজ্ঞ ও মূর্খ আরবদের হতে তারা তা সংগ্রহ করে। অথবা গোলযোগপূর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সাধারণ লাইব্রেরির পাণ্ডুলিপি তারা চুরি করত। এগুলো তারা নিজ দেশের লাইব্রেরিগুলোতে নিয়ে যেত। যখন তারা আরবি পাণ্ডুলিপির এক বিশাল ও বিরল স্তূপ জমা করলেন; তখন তা ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পাঠাতে থাকেন।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ দাঁড়িয়ে ছিল– দুইশ পঞ্চাশ হাজার ভলিয়ম। এ সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর ১৯০০ শতাব্দির একেবারে শেষ ভাগে ১৮৭৩ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের সর্বপ্রথম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। আর এ রকম অসংখ্য অগণিত কনফারেন্স তারা ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে করছেন।[৪]

শায়খ আবদুল মালিক দামাত বারাকাতুহুম-এর প্রদেয় সংজ্ঞা

শায়খ আবদুল মালিক দামাত বারাকাতুহুম মুসতাশরিক ও ইসতিশরাকের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেন, পাশ্চাত্যের যে লোকেরা প্রাচ্যের অর্থাৎ মাশরিকের (প্রাচ্যের) ইসলামি মিরাস ও তাহযিবকে তাদের অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মুসতাশরিক বলে। আর তাদের পেশার পারিভাষিক নাম হলো ইসতিশরাক।

তিনি বলেন, এদের গবেষণা কখনো শুধু গবেষণার জন্যেই হয়ে থাকে। তবে তাদের অধিকাংশ লোকেরই উদ্দেশ্য থাকে খিস্ট্রধর্ম; বরং বলুন, সেন্টপলের ধর্মীয় মতবাদের সমর্থন দেওয়া এবং ইসলামের ক্ষতি সাধন করা।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর দৃষ্টিতে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের লক্ষ-উদ্দেশ্য

মুফাক্কিরে ইসলাম ও ইতিহাসবিদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী ইসতিশরাক-এর উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে

---

৪. প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের নগ্ন হামলা।

তাদের বর্তমান সম্পর্কে বিমুখ, অতীত সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ বানানো।[৫]

প্রাচ্যবিদদের লক্ষ-উদ্দেশ্যের তিনটি পয়েন্ট

প্রাচ্যবিদদের লক্ষ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছিলাম আমার লেখা ইমাম মাহদি-এর আগমন বইয়ে। উক্ত বইয়ের বক্তব্য পাঠকদের খিদমতে উপস্থাপন করা হলো।

এক. রাসুলের প্রিয় সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মুসলিম জনমনে বীতশ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করা। কুরআন-হাদিস সম্পর্কে অযৌক্তিক বিভ্রান্তিকর (Unreasonable confusion) আপত্তি তোলা।

দুই. বর্তমান ইসলামের ধারক-বাহক (Bearer and container) আলিম সমাজ হতে সাধারণ জনতাকে দূরে রাখা।

তিন. মুসলিমদেরকে ভবিষ্যৎ কোন বিষয়ে হতাশায় রাখা। তাদের মাঝে দল-উপদল সৃষ্টি করা।[৬]

আলোচনার সারসংক্ষেপ

সুতরাং আমরা দীর্ঘ আলোচনা হতে বুঝতে পারি, আজকের ইসলাম, মুসলিম ও মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর নিয়ে যেসব অমুসলিম গবেষণা করছেন তাদেরকে ইসলামি পরিভাষায় মুসতাশরিক (مستشرق) বলা হয়। আর তাদের এই গবেষণা কর্মকে বলা হয় إستشراق। এ কর্মে যেমন খ্রিস্টান-ইহুদি সম্প্রদায় জড়িত রয়েছে, তদ্রূপ হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক ও ইসলাম নাম ধারণকারী মুনাফিক শ্রেণির অনেক লোকও আত্মনিয়োগ করেছেন ও করছেন।

তাদের সকলের লক্ষ-উদ্দেশ্য হলো, ইসলামকে পুরানো ধাচে অকেজো জীবনব্যবস্থা রূপে ফুটিয়ে তোলা। আর তাদের ধর্মের প্রতি মানুষদের আহ্বান করা। তাদের এ পর্যন্ত যত গবেষণা প্রকাশ পেয়েছে তার

---

৫. তালিবানে ইলম : পথ ও পাথেয়, পৃ. ৪৬৪; মাসিক আল-কাউসার, মারকাযুদ দাওয়াহ থেকে প্রকাশিত।

৬. ইমাম মাহদি-এর আগমন, ভূমিকা, মাকতাবায়ে ইবনে সাআদ, ২০১২ খ্রি.।

সবগুলো ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী, বিদ্বেষপূর্ণ ও মিথ্যাশ্রীত কপটতা মিশ্রিত। যার কোনাটাই সত্যের মানদণ্ডে গ্রহণীয় নয়।

প্রাচ্যবিদদের গবেষণার সূচনা হয় হিজরি ৫ম শতাব্দীতে। ভিন্ন মতে স্পেনের মুসলিমদের উপস্থিতি তথা হিজরি ৯৯ মোতাবিক ৭১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাদের গবেষণা শুরু হয়।

যুগ সচেতন আলেম মুসতফা আস-সিবায়ি রহ.

এই বইটিতে যেখানে প্রাচ্য-পণ্ডিত কিংবা প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের কথা উল্লেখ আছে, এর দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এই বইয়ে তাদের কর্ম-কাণ্ডের আলোচনা করা হয়েছে। তাদের গ্রন্থাদির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে যেমন তিনি প্রাচ্যীয়পণ্ডিতদের ভুলগুলো চিহ্নত করেছেন, বিভ্রান্তির নিরসনের চেষ্টা করেছেন ও মুসলিমদেরকে তাদের ব্যাপারে সর্তক করেছেন, অদ্রূপ নিষ্ঠার সাথে তিনি অতি প্রশংসা অথবা অজ্ঞাত সমালোচনা থেকেও নিজেকে মুক্ত রেখেছেন । এছাড়া তিনি ঐসব প্রাচ্যবিদদের কাছে গিয়েও তাদের ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও ফলপ্রদ। আল্লাহ তাকে জান্নাতের আলা মাকাম দান করুন। আমিন।

প্রাচ্যবিদগণের উক্তি

কেন আমাদের পূর্বসূরি ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক প্রকৃত আলেম-ওলামাগণ ওরিয়েন্টালিস্টদের নিয়ে লেখা-গবেষণা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন? কেনই-বা সমালোচনা করেছেন? অযথা কেন তাদের বইগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে বিশ্লেষণ ও সত্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন? যদি আমরা এসব প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দেই, তা হলে বলবো– ইসলামের শিকড় উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যেই আমাদের সত্যানুসন্ধানী আলেমগণ এ পথ অবলম্বন করেছেন। এছাড়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের কোন বিকল্প ছিল না।

আরেকটু বিস্তারিত বললে অধৈর্য হবেন না– ওরিয়েন্টালিস্টরা গবেষণা ও অধ্যয়নের সত্যকে গোপন করেছে এমন নয়; বরং তারা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে পরাভূত ও চিরতরে মুছে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে

এবং করে যাচ্ছে। আমরা যদি এক নজরে ইসলাম, মুসলিম, নবি, সাহাবা, কুরআন, হাদিস, ইসলামি ইতিহাস ও মুসলিম শাসন সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ও বিষোদ্‌গার দেখে নেই তা হলে নিশ্চতভাবে বলবো, এদের চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানো আমাদের ইমানি দায়িত্ব। তাদের প্রতিহত করা একান্ত কর্তব্য। আর সেই দায়িত্ব-কর্তব্যকে আড়াল করতে না পারায় আলেম-ওলামাগণ ওরিয়েন্টালিস্টদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য তাদের গবেষণাপত্রগুলো ঘেঁটে দেখেছেন। আর সাধারণ মুসলিমদের কাছে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন।

এ আলোচনায় আমরা প্রচ্যীয় পণ্ডিত বা ওরিয়েন্টালিস্টদের মিথ্যার বেশাতি ভরা বিষোদ্‌গারপূর্ণ মন্তব্যগুলো সংকলন করেছি তাদেরই রচিত বিভিন্ন বই থেকে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মুসলিমদের সর্তক করা। তারা যেন এসব প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের অসম্পূর্ণ মিথ্যাশ্রয়ী গবেষণাপত্র পাঠ করে বিভ্রান্তির শিকার না হন। ষড়যন্ত্র যেন তারা বুঝতে পারে। তাদের অসত্য ও কল্পনাপ্রসূত বক্তব্যগুলোতে যেন দিশেহারা না হয়।

সাধারণ ভাইদের বলবো, আপনারা ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, কুরআন-তাফসির, হাদিস-সিরাত প্রভৃতি নিয়ে পড়তে ও গবেষণা করতে চান, তা হলে কেন একজন অমুসলিমের (ইহুদি-খ্রিস্টান, হিন্দু-মুশরিক প্রভৃত শ্রেণির মানুষ) থেকে জানতে চান? তারা আপনাকে কীভাবে সঠিক তথ্য দিবে? তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে অজ্ঞতার শিকার। তারা নির্দিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এমন গবেষণায় লিপ্ত হয়েছে। আপনি যদি জানতে চান বা গবেষণা করতে আগ্রহী থাকেন তা হলে—

১. ইসলামের মৌলিক উৎস আল-কুরআনুল কারিম ও মুসলিম মনীষীদের রচিত তাফসির গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করুন। পড়ুন, তাফসিরে কাবির, তাফসিরে রুহুল মাআনি, তাফসিরে ইবনে কাসির, তাফসিরে কুরতুবি ও তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন প্রভৃতি।

২. ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস পাঠ করুন। পড়ুন, সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সহিহ ইবনে হিব্বান, সহিহ মুসতাদরাকে হাকিম, সুনানে তিরমিযি, সুনানে নাসায়ি, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে দারেমি, মুআত্তা

মালেক, মুআত্তা মুহাম্মাদ, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে ইসহাক রাহওয়াই, মুসনাদে আবু হানিফা, মুসনাদে শাফি, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, কিতাবুল আসার মুহাম্মাদ, কিতাবুল হুজ্জাহ মুহাম্মাদ ও মুয়জাম কাবির, সাগির ও আওসাত তবারানি প্রভৃতি।

৩. ইসলামের ইতিহাস জানতে চান– তা হলে ইসলামের পুরাতন ইতিহাসের গ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তারিখে বাগদাদ, তারিখে কামিল, তারিখে দামিশক, সিয়ারু আলিমিন নুবালা ও রাসুলের সিরাত সংক্রান্ত ইতিহাস, বর্ণনাসূত্র ও তথ্য নির্ভর বইগুলো পাঠ করুন।

৪. ইসলামি আইন পাঠ করার জন্য ফিকহের গ্রন্থগুলো দেখুন। পড়ুন, আল-হিদায়া, ফাতওয়ায়ে আলমগিরিয়া, মাবসুত সারাখসি, রদ্দুল মুহতার, বাহরুর রায়েক, আল-ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবাআ, ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু ও মউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ।

৫. এছাড়া কুরআন-হাদিস ও ফিকহ বুঝার জন্য রয়েছে মৌলিক নীতি বা উসুল। আর কুরআন-হাদিস ও ফিক্হ-এর প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদা মান নির্ণয়ক, স্থায়ী ও গতিশীল উসুল বা মূলনীতি সংকলিত রয়েছে। এসব উসুলের মাধ্যমে আপনি প্রকৃত গবেষণার পথ খুঁজে পাবেন। কুরআন-হাদিস ও ফিকহের ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি ও নতুন বিষয়গুলোর সমাধানের পথ দেখাবে।

৬. এছাড়া আরো কিছু সহায়ক বিষয়, যা একজন গবেষককে প্রকৃত গবেষণা ও সত্য তথ্য পেতে সহায়তা করে। তা হলো ভাষাজ্ঞান। ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে গবেষণা করতে গেলে কুরআন-হাদিসের কথা চলে আসে। আর কুরআন-হাদিসের ভাষা আরবি। তা ছাড়া কুরআন-হাদিস নির্ভর যত জ্ঞান চর্চা করা হয়, তার সব মৌলিক গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় লেখা। তাই ইসলামি গবেষণা মানেই হলো আরবিভাষার চর্চা। এ কারণে ইসলামি গবেষণা ও সত্য বুঝার জন্য আরবিভাষা অপরিসীম ভূমিকা পালন করে।

অন্যের করা অনুবাদ থেকে বুঝা আর নিজে সরাসরি আরবিভাষা থেকে বুঝা ও তথ্য সংগ্রহ করা এক নয়। সঠিক মর্ম উদঘাটনে মূল ভাষার

প্রয়োজনীয়তার বিকল্প নেই। প্রাচীন-বর্তমান পৃথিবীর ওরিয়েন্টালিস্টদের ভুল বুঝা বা অপ-প্রচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণও এটা। কারণ তারা নিজের থেকে বুঝে না। বরং কারো মনগড়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পাঠ বা শ্রবণ করে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের পথে পা বাড়ায় ও অন্যদের বিভ্রান্ত করেন।

তাই অনুবাদ পরিহার করে সঠিকভাবে আরবিভাষার চর্চা করে ইসলাম, কুরআন-হাদিস, ইতিহাস ও আইন প্রভৃতি নিয়ে মন্তব্য করার অনুরোধ থাকল। মৌলিক গ্রন্থের বিকল্প নেই। মৌলিক গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকৃত গবেষণা করা সম্ভব।

ওরিয়েন্টালিস্টদের বিষোদগার উক্তি

এখন প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের কিছু ভ্রান্ত অযৌক্তিক মন্তব্য বা বিষোদগার উল্লেখ করছি। তারপর ইনসাফের দৃষ্টিতে সত্যানুসন্ধানী প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের কিছু উক্তি এ লেখার শেষে সংযোজন করবো, যাতে এ কথা স্পষ্ট হয়— সত্যানুসন্ধানী হলে প্রকৃত সত্য উদঘাটন কঠিন নয়, তবে ওরিয়েন্টালিস্টদের বিষোদগারগুলো বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করছি।

আল-কুরআনুল কারিমের ব্যাপারে মিথ্যাচার

১. টমাস ভান এ্যারবিউনস (১৫৮৩-১৬২৩খ্রি.) বলেন, কুরআন বাইবেলের মত একটি গতানুগতিক হাস্যকর গ্রন্থ।[৭]

২. এইচ. এইচ. ব্রো বলেন, কুরআনের উপর কবি উমাইয়া ইবনে আস-সালতের কবিতার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।[৮]

৩. এফ. আর. বুল (১৮৫০-১৯৩২ খ্রি.) বলেন, কুরআনে বর্ণিত নবি হুদ আলাইহিস সালাম ও সালেহ আলাইহিস সালামের ঘটনা পরস্পর বিরোধী ও অস্পষ্ট।[৯]

৪. জার্মানের প্রাচ্যবিদ তানিমান (১৮১৯ খ্রি.) বলেন, মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে কুরআন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী।[১০]

---

৭. মুয়জামু ইফতিরাউল গরাব আলাল ইসলাম, পৃ. ১৬।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৫. প্রাচ্যীয় পণ্ডিত ড্যানিয়াল নোরমান বলেন, কুরআনের উৎস হলো, পূর্ববর্তীদের কল্প-কাহিনি।[১১]

৬. নেদারল্যান্ডের ডোযি (১৮২০-১৮৮৩ খ্রি.) বলেন, কুরআন একবারে নীচুমানের স্বাদহীন গ্রন্থ। এর মাঝে নতুন বলে কিছু নেই।[১২]

৭. প্রাচ্যবিদ সিডরস্কি তার বই 'উসুলুল আসাতিরিল ইসলামিয়্যা ফিল কুরআনি ওয়া ফি সিরাতিল আনবিয়া-তে বলেন, কুরআনের ঘটনাগুলো ইহুদি-খ্রিস্টানের ধর্মীয় উৎস থেকে সংকলন করা হয়েছে।[১৩]

৮. জর্জ স্যাল (১৬৯৭-১৭৩৬ খ্রি.) সংকলিত অনুবাদ গ্রন্থে (প্রকাশিত ১৭৩৬ খ্রি.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের সংকলক ও প্রধান আবিস্কারক ছিলেন।[১৪]

৯. ভাষাবিদ ক্রাকোভকিজ (১৮৮৩খ্রি.) 'তারিখুল আদব আল-জুগারাফি ইনদাল আরব' গ্রন্থে বলেন, কুরআন হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সংকলন সমষ্টি।[১৫]

রাসুল ও হাদিস সম্পর্কে মিথ্যাচার

১. ফ্রান্সের প্রাচ্যীয় পণ্ডিত বারিহ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মি ছিলেন না। তিনি সুরা আলে ইমরানের ৭৫ নং আয়াতের তাফসিরে এ কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬]

২. কারল ব্রোকলামান (১৮৬৮-১৯৫৬) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় কতিপয় ইহুদি-নাসারাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, অর্থাৎ ইসলামের বাণীগুলো ইহুদি-নাসারাদের ধর্মগ্রন্থ হতে সংকলিত।[১৭]

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৩. কারল ব্রোকলোমান (১৮৬৮-১৯৫৬) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্প্রদায় এতটা শিরক-ভ্রষ্টতায় মত্ত ছিল যে, ফলে তার মাথায় নতুন ধর্মের ধারণা ভর করেছে।[১৮]

৪. প্রাচ্যীয় বুডলি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মযাজক বুহাইরার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[১৯]

৫. প্রাচ্যীয় অধ্যাপক রির্ভোস বলাশির (১৯০০-১৯৭৩ খ্রি.) বলেন, রাসুল মদিনাতে আসার পর অহির সংরক্ষণ ও লেখালেখির সূচনা হয়েছে।[২০]

৬. স্যার হ্যামিলটন আর এ গিব (১৮৯৫ খ্রি.) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার তৎকালীন সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্ট। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'মাযহাব আল-মহাম্মাদীতে বলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

৭. গোলন্ড যিহার (১৮৫০-১৯২১ খ্রি.) বলেন, ভ্রমণকালে রাসুল ইহুদি-নাসারাদের সাক্ষাত লাভ করেন। এরপর তিনি ধীরে ধীরে মক্কার চারিত্রিক জীব ও ধর্মীয় অন্ধকার নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। এভাবে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের গভীরতায় পৌঁছান। এক পর্যায়ে তিনি মক্কার স্বাভাবিক জীবনের বিপরীতে দাঁড়ান। ব্যক্তিগত ব্যবসার কাজে গিয়ে ইহুদি-খ্রিস্টানদের থেকে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ধাবিত হন।[২১]

গোল্ড যিহার-ই প্রথম প্রাচ্যীয় পণ্ডিত, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টা করেন। তার মতে হাদিস দুশত বছর অলিখিত ও অরক্ষিত ছিল এবং তৃতীয় শতাব্দিতে গিয়ে হাদিস সংকলন করা হয়। আর এগুলো রাসুলের বাণী নয়, বরং অন্যদের কথার সংকলন।

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

তার ধারণা–

ক. অসংখ্য হাদিস এমন রয়েছে, যার সম্পর্কে আমাদের জানা নেই যে, তা রাসুল বলেছেন কিনা?

খ. রাসুলের কোন হাদিস-ই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এটি একবারে সহিহ-বিশুদ্ধ।

গ. হাদিসের বিশাল একটি অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দির ধর্মীয় রাজনৈতিক ও সমাজিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে।

৮. তিনি হাদিসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য আবু হোরায়রা ও ইমাম যুহরি রহ.-সহ আরো অন্যান্যদের সমালোচনা করেছেন।[২২]

৯. জে স্কচ্ট (১৯০২ খ্রি.) বলেন, আইন সংক্রান্ত হাদিসগুলো যে রাসুল থেকে বিদ্দদ্ধভাবে বর্ণিত তা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ।[২৩]

১০. বার্ন কারা ডি (১৮৬৮-১৯৩০ খ্রি.) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধর্মের কতিপয় দার্শনিক গবেষক অথবা তৎকালীন একত্মবাদে বিশ্বাসী লোকদের থেকে শ্রবণ ও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।[২৪]

১১. ভাষাবিদ বি কাজিমিরস্কি (১৭৮০-১৮৬৫ খ্রি.) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় পাগলামীর কারণে মৃগীরোগ ও হিংস্রতায় আক্রান্ত ছিলেন।[২৫]

১২. ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড (১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রি.) বলেন, হাদিসের ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। এটি একটি মনগড়া সংকলন।

ইসলামি যুদ্ধ, বিজয় ও শাসন

১. স্যার টমাস ওয়াকার আরনোল্ড (১৮৬৪-১৯৩০ খ্রি.) বলেন, ইসলামি বিজয়গুলোর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও প্রাচুর্য অর্জন।[২৬]

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৭০।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২. প্রাচ্যীয় পণ্ডিত ইযাডোর বাজি বলেন, মুসা বিন নুসাইর তরবারির সাহায্যে সারকাসতা (ইউরোপের একটি এলাকার নাম) বিজয় করেছেন।[২৭]

৩. ইভারস্ট লিভি প্রভেনসাল (১৮৯৩-১৯৫৫ খ্রি.) বলেন, মুসলিমগণ সন্ধির মাধ্যমে এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে বৈষম্যমূলক আচরণ করে।[২৮]

৪. তিনি আরো বলেন, আরবরা স্পেন বিজয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা (জুলুম, নির্যাতন ও হানাহানি) অবলম্বন করেছিল।[২৯]

৫. কারল ব্রোকল্যামান (১৮৬৮-১৯৫৬) বলেন, বিজয়ী আরবরা অনারবদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে এবং অনারবদের তাদের অবস্থান থেকে হটিয়ে দিয়েছে।[৩০]

৬. কে এইচ হেনরিশ (১৮৬৭-১৯৩৩ খ্রি.) বলেন, ইসলাম মধ্যযুগে প্রসারতা লাভ করেছে এবং খ্রিস্টবাদ প্রচারে কঠোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।[৩১]

৭. ষষ্ঠদশ বাবা ভ্যাটিক্যান বলেন, ইসলাম একমাত্র তরবারির মাধ্যমে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে।[৩২]

৮. ষষ্ঠদশ বাবা আরো বলেন, ইসলাম মানব বিবেকের উপযোগী নয়।[৩৩]

ইসলামি খিলাফতব্যবস্থা

আরনোল্ড এর মতে, ইসলামি খিলাফত যে-কোন প্রকার সমালোচনা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী ছিল।

২৭.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
২৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
২৯.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
৩০.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
৩১.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৩২.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫৩।
৩৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

রাসুলের সাহাবিদের প্রতি বিষোদ্গার

আরনোল্ডের মতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর তিনজন সাহাবি ক্ষমতা-সম্পদ ভাগাভাগি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।[৩৪]

ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার

১. প্রাচ্যীয় পণ্ডিত রিনান আর্নাস্ট (১৮২২-১৮৯২ খ্রি.) বলেন, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।[৩৫]

২. ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদ লুইস বির (১৮০৮-১৮৭৫ খ্রি.) বলেন, ইসলামের কিসাসবিধানে (হত্যার বদলে হত্যা) মানবতা অনুপস্থিত। তিনি বলেন, তুমি কুরআনে শিথিলতা পাবে না, যা ইনজিলে রয়েছে। ইনজিলের শিথিলতাগুলো প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। অন্য দিকে তুমি লক্ষ্য করবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ বিচারের ক্ষেত্রে মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দিতেন। অর্থাৎ তিনি কাউকে ক্ষমা-মার্জনা করেননি।[৩৬]

৩. ইসলামিবিশ্ব পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কে ক্র্যাগ বলেন, হয় ইসলামের মাঝে মৌলিকভাবে কোন পরিবর্তন করতে হবে অথবা চলমান জীবন থেকে তাকে পরিহার করতে হবে।[৩৭]

৪. এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলামের অন্যতম সম্পাদক এল ম্যাসিনন (১৮৫৮-১৯৪০ খ্রি.) তার 'আদ-দিয়ানাতুল মুহাম্মাদিয়া' গ্রন্থে বলেন, ইসলাম ধর্মের পর্দার বিধানের কারণেই একাধিক বিবাহ সংগঠিত হয়।[৩৮]

উপর্যুক্ত উক্তিগুলো প্রাচ্যবিদদের বই-প্রবন্ধ ও পত্রিকায় লেখা আলোচনা থেকে সংকলিত। সুতরাং এগুলো যে তাদের উক্তি তা পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

৩৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৩৫.প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
৩৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৩৭.প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।
৩৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

কেন উক্তিগুলো সংকলন করলাম?

যে কোনো পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমরা প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের উক্তিগুলো সংকলন করলাম। এর উত্তরে আমরা কারণ হিসাবে বলবো—

১. অনেকে হয়তো বলবেন, কেন আমরা প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের সমালোচনা করছি এবং কেনই-বা তাদের গবেষণাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছি। এগুলো শুধু শুধু করছি। আমাদের হাতে কোন ডকুমেন্ট নেই। তথ্য ছাড়াই আমরা সমালোচনায় লিপ্ত। আমরা তাদেরকে জানাতে চাচ্ছি, দেখুন তারা কেন ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতেন। বিদ্বেষ ছড়ানোই ছিল তাদের গবেষণার মূল টার্গেট। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের ভ্রান্ত গবেষণার আসল চেহারা। উপর্যুক্ত উক্তিগুলো থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়।

২. প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণায় সত্যকে কতটা আড়াল করে রাখা হয়েছে তা সাধারণ পাঠকমাত্রই বুঝে আসবে।

৩. আর আমাদের দেশের আধুনিকমনা, অবান্তর প্রগতিবাদী ও ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানহীন ধর্মান্ধরা যে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ভ্রান্ত গবেষণার ফলাফল দিয়ে ইসলামের উপর আঘাত করে, তা যেন স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, তাদের দাবি আর প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের দাবি একই। সমালোচনার ধরনও একই। তাই ঐসব অর্থহীন প্রগতিবাদী ও ধর্মহীন ধর্মান্ধবাদীদের ব্যাপারে সাবধান থাকুন।

৪. ইসলামি গবেষণা দেখলেই তা যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ, এখানে উল্লিখিত অনেক প্রাচ্যীয় পণ্ডিতই ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে তাফসির, হাদিসের ইতিহাস ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ, আকিদা-বিশ্বাস ও ইসলামি ইতিহাস নিয়ে বই রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থগুলোতে ইসলামের লেবেল লাগিয়ে দিয়ে ইসলাম বিরুধী আলোচনা-সমালোচনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। পাঠকের কাছে ইসলামকে মূল্যহীন ও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

৫. সমালোচনার হোতাদের চিহ্নিত করার জন্য আমরা উক্তিগুলো সংকলন করেছি, যাতে করে পাঠকগণ তাদের ব্যাপারে সর্তক থাকেন।

৬. পাঠকের সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে যায় এসব সমালোচক কুরআন, হাদিস, ইসলামি আইন, ইসলামি ইতিহাস, আকিদা, সাহাবি, আরবিভাষা ও ইসলামের অনুসারীদের নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক সমালোচনায় লিপ্ত। তাদের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট; আর তা হলো ইসলামকে একটি প্রশ্নবিদ্ধ ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা হিসাবে অগ্রহণীয় করে তোলা।

আমরা এ বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ঠুনকো ও খোঁড়া যুক্তি-তর্কের কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। তাদের আলোচনাগুলো একেবারে ভিত্তিহীন ও দলিল-প্রমাণহীন। তারা যে সমালোচনা করেছেন তা কোন গঠনগত সমালোচনা নয়। সময় সাপেক্ষে আমরা সমালোচনার জবাব আলাদা সংকলন ও বই রচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকল, ইসলামকে জানার জন্য আল্লাহর প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, রাসুলের মুখনিঃসৃত হাদিস ও বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে সংকলিত ইতিহাস সরাসরি মুসলিম ও ইসলামের প্রকৃত স্কলারদের লেখা থেকে পাঠ করুন। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রশংসনীয় উক্তি

প্রাচ্যবিদ বা ওরিয়েন্টালিস্টগণের অনেকেই ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। অনেকে সমালোচনা করেছেন। আপত্তি উত্থাপন করেছেন— ইসলাম, মুসলিম, নবি, রিসালাত, কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ, তারিখ, আরবিভাষা ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব, ইমাম, মুজতাহিদ ও আলেমদের ব্যাপারে। মিথ্যাশ্রয়ী হয়ে কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গবেষণার ভুলে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের আহত করার চেষ্টা করেছেন।

পাশাপাশি প্রাচ্যবিদদের অন্য এক শ্রেণির গবেষক ও সমালোচক তুলে ধরেছেন আলাদা চিত্র ও গবেষণা পত্র। তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে ইসলাম-মুসলিমদের প্রশংসা। তারা প্রশংসা করেছেন নবি, রাসুল, কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ ও তারিখ।

ইসলামকে সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা রূপে স্বীকার করছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবি হিসাবে মেনে নেওয়া ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব উপাধি প্রদান করেছেন।

প্রাচ্যবিদগণের মাঝে যারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং আল্লাহ তাদের জন্য হেদায়েতের দরজা খুলেছেন, তারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সত্যকে প্রচার-প্রসার করার জন্য ভিন্ন আঙ্গিকে বই লিখেছেন। অন্যদেরকে সত্য গ্রহণের আহ্বান করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রশংসনীয় কিছু উক্তি পাঠকের সামনে উল্লেখ করছি; তবে যারা রাসুল, কুরআন, হাদিস, সাহাবি, ইসলামি আইন, যুদ্ধ ও ইতিহাস প্রভৃতি নিয়ে প্রশংসনীয় মন্তব্য করেছেন তাদের সংখ্যা অগণিত। তাদের কিছু ব্যক্তি হলেন–

Arthur N. Wollaston C. I. E. (Halg Hours with Muhammad), Rev. R. Macgregor (Yorkshire Post), R. Bosworth Smith M. A. (Muhammad and Muhammedanism) , Arthur Gilman (The Saracens), Ignaz Goldziher (Introduction to Islamic Theology and Law), Alfred Gulliaume (Islam), Edward Gibbon (The Decline and Fall of the Roman Empire), S. D. Goiten (Study in Islamic History and Institutions), E. H. Palmer (The Koran), A. S. Tritton (M. A. D. Litt) (Islam-Belief and Practice), N. J. Coulson (A History of Islamic Law), N. N. E. Bray (Shifting Sands), Annie Besant (The Life and Teachings of Muhammad), A. C. Bouquet (Comperative Religions), Edward A. Freeman (The History and Conquest of the Saracens), Annie Marie Schimmell (Gabriel's Wing), H. M. Hyndman (The Awakening of Asia), Bishop Boyd Carpenter (The Permanent Element in Religion), Thomas W. Arnold (The Caliphate), Thomas Carlyle (On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History), Tor Andrae (Mohammed), Rev. T. P. Hughes (Notes on Muhammadanism), James A. Michener (Islam:The Misunderstood Religion), G. Lindsay Johnson (F. R. C S.) (The Two World), Joseph J. Nunan (Islam and Utopean Civilization), John J. Pool (Studies in Muhammedanism), John Joseph Lake (Islam its Origin, Genius and Mission), John Devenport (An Apology for Muhammed and The Koran), John William Draper (M. D. L.

L. D.) (A History of the Intellectual Development of Europe), Joseph Schacht (The Cambridge History of Islam), John Austin (Muhammad The Prophet of Allah), Charles R. Watson (What is this Moslem World?), W. Montagomery Watt (Mohammad at Mecca), D. H. Hogarth (A History of Arabia), W. M. Thomson (Democratic Readings), Duncan Black Macdonald (The Religious Attitude and Life in Islam), Robert L. Gullick (Muhammad The Educator), C. Snouk Hurgronje (Muhammedanism), Samuel M. Zwemer, F. R. G. S. (The Moslem World), Selwyn Gurney M. D. (Readings from World Religions), Stanwood Cobb (Islamic Contribution to Civilization), Stanley Lane-Poole (The speeches and Table Talk of the Prophet Muhammad), Philip K. Hitti (Islam- Away of life), Frank Ballard (Why Not Islam), Kenneth Cragg (The Call of the Minaret), Gustave Evon Grunebaum (Medieval Islam), Major Arthur Glyn Leonard (Islam-Her Moral and Spiritual Value), Maurice Gaudefroy (Muslim Institutions), Marcus Dods (Muhammed Buddha and Christ), William Muir (The Life of Muhammad), Wilson Cash (The Expansion of Islam), R. V. C. Bodley (The Messenger), Washington Irving (Mahomet and His Succssors), Von Kremer (The Orient Under the Caliphs), Hamilton A. R. Gibb (Studies on the Civilization of Islam).

যাদের নাম ও বইয়ের নাম[৩৯] উল্লেখ করা হলো তাদের প্রশংসনীয় উক্তি উল্লেখ করার মানে এই নয় যে, তারা সর্বদাই ইসলামে সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করবেন; বরং একই ব্যক্তি অন্য কোন বইয়ে ইসলাম সম্পর্কে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ইসলাম, নবি ও কুরআন-হাদিস নিয়ে ভ্রান্ত সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। তাই প্রশংসাকারীদের তালিকায় নাম আসলেই তারা একেবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যান না।

---

৩৯. প্রথমে ওরিয়েন্টালিস্টের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বন্ধনিতে তার লিখিত বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত বইয়ে তিনি ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন।

সাথে সাথে পাঠকদের আমরা এ মেসেজও দিচ্ছি, যদি সৎ উদ্দেশ্য থাকে আর সত্য গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে একজন নিঃস্বার্থ গবেষক ইসলাম সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে বাধ্য হবেন— এটাই স্বাভাবিক।

১. Wolfgang Goeth Johann (1749-1832 খ্রি.) বলেন, আমি ইতিহাসে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান করছিলাম। অবশেষে আরবের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই বিশেষ গুণে বিশেষিত পেলাম।[৪০]

একই প্রাচ্যীয় পণ্ডিত অন্যত্র বলেন, আমরা ইউরোপীয়ানরা আমাদের সকল বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হইনি।[৪১]

২. Gustave Le Bon বলেন, যদি কর্মের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্ধারণ করা হয়, তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পাশ্চাত্যে অনেকে এখন তাঁর ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া শুরু করেছেন; তবে অনেক ইতিহাসবিদ বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে তাঁর অসামান্য অবদান স্বীকার করছে না।[৪২]

৩. কার্ল মার্কস বলেন, জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই তাঁর নবি হওয়াকে স্বীকার করে। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীর বুকে রাসুল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন।[৪৩]

৪. ইন্ডিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) বলেন, ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রকার উন্নত চরিত্রের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছেন। আমরা তাঁকে সকল কল্যাণের কাজে অনুসরণীয় হিসাবে স্বীকার করি। তিনি বিশ্বকে প্রকৃত ইসলামের মাধ্যমে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছেন।[৪৪]

---

৪০. আফাকে জাদিদ লিদ দাওয়াহ, লেখক আনওয়ার জুন্দি।

৪১. শামসুদ্দিন তাসতিয়াবু আলার গরাব।

৪২. হাদারাতুল আরাব, পৃ. ১১৫।

৪৩. আকওয়ালুল মুসতাশরিকিনাল গরাব, পৃ. ০২।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩।

৫. আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ওয়াশিংটন ল্রিং বলেন, রাসুল ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি বাসার লোকদেরকে সালাম ও সম্মান না জানিয়ে প্রবেশ করাকে অপছন্দ করতেন।[৪৫]

৬. Thamas Carlyle (১৭৯৫-১৮৮১ খ্রি.) বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত ভালবাসি। কারণ, তিনি লোক দেখান এবং লৌকিকতাহীন একজন মানুষ ছিলেন।

তিনি অন্যত্র বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আলোকবর্তিকা। সেই আলোই পৃথিবীকে আলোকিত করেছে।[৪৬]

৭. মাইকেল হার্ট বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইতিহাসের বরেণ্যদের মাঝে প্রথমে আনার কারণে পাঠক হয়তো অবাক হবেন; কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি পার্থিব-অপার্থিব উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে সফলতা অর্জন করেছেন।[৪৭]

৮. পাদ্রী আর ম্যাকগ্রেগর বলেন, পরস্পর কলহে লিপ্ত আরবের যুদ্ধবাজ সমস্ত গোত্রে মৈত্রী স্থাপনে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এক আল্লাহর ইবাদতের সূত্রে তাদেরকে গেঁথে দিতে সফলতা তাঁর হস্ত চুম্বন করে। রাসুল হিসাবে এই ঐতিহাসিক অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁর এই অবিশ্বাস্য সফলতায় আমরা মুগ্ধ, অবাক। আমাদের মনে তাঁর প্রশংসার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। তিনি আজীবন ক্ষুৎ-পিপাসার সাথে লড়েছেন। এতে তিনি সীমাহীন ধৈর্যের অবিচল পাহাড় হওয়ার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা কারো অজানা নয়। মদপান এবং নগ্নতার পরিবেশকে চির উৎখাত করে নিঃসন্দেহে তিনি আরবদেরকে মানবতার মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করে দিয়েছিলেন।[৪৮]

---

৪৫. Life of Mohammad, page no : 302-303.

৪৬. Heroes and Hero Worship and the Heroic in History

৪৭. Ranking of the Most Influential the Persons of History.

৪৮. ইয়র্ক শায়্যার পোস্ট, ৮ জুন ১৯৯৫ ইং; পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টিতে রাসুলে আকরাম (সা.), পৃ. ১৪। মূল, প্রফেসর শরিফ বাকা, ভাষান্তর, মুফতী শহীদুস সালাম কাসিমী, ২০০৬ ইং।

৯. আর বসওয়ার্থ স্মিথ এম. এ. বলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যায়ের মূলোৎপাটন করেছেন, অপরাধ দমনে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন। এমন না করলে আরব এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে মানবাধিকার লঙ্ঘন, শিশুহত্যা, কন্যাসন্তান হলে জীবন্ত দাফন, গৃহযুদ্ধে মেতে থাকা, যত ইচ্ছা বিবাহ করতে থাকা, কৃতদাসদের উপর সীমাহীন নির্যাতন চালানো, জুয়াতে মত্ত এবং মদে মাতাল থাকা ইত্যাদি হেরাচরিত অপরাধ চলতেই থাকত।[৪৯]

১০. আর্থার গিলম্যান বলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক প্রশংসার পাত্র। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর তিনি শত্রুদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করা বিগত সমস্ত নির্যাতন মাটি চাপা দিয়ে সব ভুলে গিয়েছিলেন। সব শত্রু হাতের মুঠোয় আসার পরও প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে মোটেই জ্বলে উঠতে দেননি, যেটা সচরাচর অন্যদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আরো এক ধাপ এগিয়ে তিনি নিজের লশকরদেরকে যে কোন মূল্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত না হতে আদেশ জারি করেন। এতে রেকর্ড সৃষ্টির জগতে তিনি এক অভাবনীয় অধ্যায়ের সূচনা করেন। অন্য বিজয়ীদের ন্যায় দাম্ভিকতার পরিবর্তে সীমাহীন উদারতা ও বিনয়ের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিভোর থাকেন।[৫০]

১১. এন. এন. ই. ব্রে বলেন, মধ্যআফ্রিকার বাসিন্দা, নগ্ন জঙ্গলে জীবনযাপনকারী হজের সময় সাদা পোশাকে আবৃত। হিন্দুস্তানী শাহজাদাও শাহী রেশমী পোশাকের পরিবর্তে ঐ একই সাদা পোশাকে আবৃত। এভাবে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান হয়ে যায়। মক্কাতে তারা শুধু মুহাম্মাদী ভ্রাতৃত্বের আলোকে সম্বিলিত হয়। তারা তথায় পরস্পর মতবিনিময় করে। মুসলিম বিশ্বে উদ্ভব নানা সমস্যা নিয়ে তথায় তারা পর্যালোচনা করতে থাকে। হজ পালন শেষে তারা নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে ফিরলে তাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, এলাকাবাসী সবাই তাদের নিকট সমবেত হয়, যাতে তারা হাজিদের থেকে তাদের অভিজ্ঞতা

---

৪৯. মুহাম্মাদ এন্ড মুহাম্মডানইযম, ১২৫, লন্ডন ১৮৭৬।

৫০. আরব মুসলমান, পৃ. ১৮৪-১৮৫, লন্ডন, ১৮৮৭ ইং।

এবং সুবিধা-অসুবিধার বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারে। মতবিনিময় এবং প্রচার-প্রসারের জন্য এই অভিনব পদ্ধতির সামনে ইউরোপের সুপরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা তেমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না।[৫১]

১২. এ. সি. বোকে বলেন, পতনশীল রোম সাম্রাজ্যের তুলনায় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবিশাল মধ্যপ্রাচ্যে নিজের অনুসারীদের মধ্যে অধিক সুষ্ঠু ও সুসংহত, অভিনব এবং অধিক বলিষ্ঠ রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন।[৫২]

১৩. এনি মেরি শিমেল বলেন, এ সত্যকে অকপটে স্বীকার করতে হয় যে, মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইউরোপের বিতর্কিত বই-পুস্তক, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এবং সাহিত্য সমালোচনাতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও চরিত্রকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে তোলা হয়েছে। তাঁর এবং তাঁর মিশনকে ইনসাফের সাথে তুলে ধরতে অমুসলিম বিশ্বের কয়েক শতাব্দী লেগেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন পদ্ধতি বুঝতে শুধু এই অপচিন্তধারাই অমুসলিম জ্ঞান পিপাসু এবং মনীষীদেরকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে। ফলে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামি রাষ্ট্রে যে সুমহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, মধ্যম পর্যায়ের ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণ তা থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।[৫৩]

১৪. কুফরের আবাসস্থল আরবে ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণভাবে এক নতুন মতবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দুই সমাজব্যবস্থা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় উভয়ের মাঝে আসমান-জমিনের দূরত্ব ছিল। এ কথাগুলোর কোনটাই ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। আরব জগতে ইসলামের জয়যাত্রা এবং প্রতিষ্ঠার ফলে সেখান থেকে পশুত্ব, বর্বরতা উৎখাত হয়েছিল, মানবাধিকার লঙ্ঘন নির্মূল হয়েছিল। শুধু এই মহান বিষয়গুলো স্বর্ণাক্ষরে উল্লেখ করলেই তার অবদান শেষ হয় না; বরং ইসলাম তো পূর্বের সমস্ত জীবনব্যবস্থাই পাল্টে দিয়ে তাদের মাঝে এক নতুন জীবনের সূচনা করেছিল। তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে এই নতুন

---

৫১. পরিবর্তনশীল মরুভূমি, পৃ.১৬, লন্ডন-১৯৩৭ইং।

৫২. বিভিন্ন ধর্মের তুলানামূলক সমীক্ষা, পৃ. ২৬৯-২৭০ লন্ডন, ১৯৫৪।

৫৩. বল জিবরিল, পৃ. ১৪৮-১৪৯, ১৯৬৩ ইং।

সমাজব্যবস্থার যতই প্রয়োজন থাকুন না কেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের সমাজব্যবস্থা কিছুতেই তা মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না।[৫৪]

১৫. এফ. আর সি. এস জি. লিন্ডসে জনসন বলেন, অধিকাংশ খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। এটা খুবই মারাত্মক। তারা এই বাস্তবকে প্রকাশ করতে চায় না যে, যে ধর্মকে মানবজাতির একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নিজেদের জীবনযাত্রার প্রত্যেক স্তরে বাস্তবায়ন করেছে, নিঃসন্দেহে তাতে অসংখ্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। আর তার বুনিয়াদ অত্যন্ত মজবুত, এতেও কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের আদর্শ গড়ার বুনিয়াদ যে ধর্ম, সেই ধর্মপ্রাসাদের বুনিয়াদ অত্যন্ত মজবুত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা পাগলের প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

খ্রিস্টানরা কুরআন সম্বন্ধে আমাদেরকে এমন অনেক অনেক অহেতুক কথায় বিশ্বাসী বানাতে চেষ্টা করেছে, যেগুলি হযরত মুহাম্মাদ কখনো বলেননি। এমনকি ঐ সমস্ত ভিত্তিহীন কথা কুরআনের কোন নির্ভুল তরজমাতেও পাওয়া যায় না।[৫৫]

১৬. জন জোসেফ লেক বলেন, এটা একটা অভাবনীয় বাস্তবতা যে, গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ায় বাকি বিশ্বের যখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই ইসলামি বিশ্বে ছিল সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা। তখন কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমানকে নিজের গোলাম বানানো কিছুতেই সম্ভব ছিল না। যুদ্ধবন্ধী অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করলেই মূলত তারা স্বাধীন হয়ে যেত। শুধু এটাই নয়, বরং বর্ণ ভেদাভেদ সত্ত্বেও তারা নৈতিকতা এবং কাজে অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় সমান সমান হয়ে যেত।[৫৬]

১৭. রবার্ট এল গাল্লিক বলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আধুনিক বিশ্বের সেই সমস্ত সংস্কারকদের তুলনায় শিক্ষাগুরু

---

৫৪. তাবলিগে ইসলাম, পৃ. ৪২, লন্ডন ১৮৯৬ ইং।

৫৫. দুই দুনিয়া, ম্যানচেস্টার, ১৯৪০ ইং।

৫৬. ইসলাম ইটস ওরিজিন, জিনিয়াস এন্ড মিশন, পৃ. ৪৬ লন্ডন, ১৮৭৮ইং।

হিসাবে অধিক পূর্ণ ছিলেন, যাদের স্বাধীন শিক্ষা ইউরোপের গৃহযুদ্ধের সময় যুদ্ধ এবং জুলুম রুখে দিতে সক্ষম ছিল না।

তিনি একই বইয়ের অন্যত্র বলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম ঐশী প্রত্যাদেশ বা অহি হয়— 'পড়ুন'। তিনি বলেন, আমি পড়তে সক্ষম নই। ব্যক্তি বা সমাজের জন্য তাঁর দিক-নির্দেশনা অর্জিত শিক্ষার ফল ছিল না। কেননা, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এমন কোন প্রামাণ্য তথ্য পেশ করতে সক্ষম হয়নি— কুরআনের কোন একটি সুরা সপ্তম শতাব্দীর কোন আরবিয় ব্যক্তির লিখিত। বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ প্রবৃত্তির দাসত্বে কখনো কিছুই বলতেন না। কেননা তাঁর বাণী সরাসরি অহি হত।[৫৭]

১৮, সি স্নোক হরগ্রোনজি বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ মধ্যযুগে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম সম্বন্ধে যে বীভৎস আকৃতি তুলে ধরেছিল, বর্তমানে আমাদের নিকট তা একটা মহা অপবাদ এবং খুবই লজ্জাকর বলে মনে হয়।

রোমান ক্যাথলিকরা প্রটেস্টান্টদের উপর অপবাদ লাগানোর জন্য অধিকাংশ সময় দীনে মুহাম্মাদীর সাথে তুলনা করত। এ সময় ইউরোপবাসী তুর্কিদের কারণে খুব ভীত হয়েছিল। আর তুর্কিদের ক্ষমতা দখলের মূলে যে তাদের ধর্ম ছিল, এটা সবার ভালভাবে জানা ছিল।[৫৮]

১৯. ক্যানেথ ক্রাগ বলেন, ক্রুসেডযুদ্ধে লড়াইকারী খ্রিস্টানদের ঐতিহাসিক পরাজয়ের তিক্ত স্মরণ এবং পরবর্তীতে তুর্কি উসমানি খিলাফতের সাথে পূর্ব থেকে চলে আসা তাদের বৈরিতা খ্রিস্টান জগতকে আরো তিক্ত করে তোলে। এ কারণে ইলাম এং পয়গামবরে ইসলামের প্রতি তিক্ততা থেকে এক জঘন্য অপবাদ প্রচার করতে শুরু করে।[৫৯]

---

৫৭. মুহাম্মাদ দ্য এডুকেটর, ১২ লাহোর, ১৯৭৫ ইং ও প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩, লাহোর, ১৯৭৯ ইং।

৫৮. মুহাম্মাদানিযম, পৃ. ৪-৬, ১৯১৬ ইং।

৫৯. দ্য কল অফ দ্য মিনারেট, পৃ. ১৮৭, আমেরিকা, ১৯৫৬ ইং।

২০. হ্যামিলটন এ আর গিব বলেন, এ বিষয়টি আন্তর্জাতিভাবে স্বীকৃত যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্কার নারী জাতির মর্যাদাকে বিশেষভাবে উন্নত করেছে।[৬০]

২১. পাশ্চাত্যের এক বিখ্যাত স্কলার ব্রেফল্ট 'দ্য ম্যাকিং অফ হিউমানিটি' বইয়ে উদারচিত্তে স্বীকার করেন, আরবি মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছেন। তার ভাষায়—

"It was not science only which brough Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its glow European life." (p.202)

শুধু বিজ্ঞান ইউরোপকে জীবন দান করেনি, বরং ইসলামি সভ্যতার নানাবিদ প্রভাব ইউরোপের জীবনকে আলোকিত করেছে।[৬১]

ইসলাম, মুসলিম, রাসুল, কুরআন, হাদিস, ইতিহাস, যুদ্ধ, ইসলামি বিধান প্রভৃতি নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ওরিয়েন্টালিস্টদের কিছু মন্তব্য এখানে সংকলন করেছি। এরকম অসংখ্য পজিটিভ বাণী ও সমালোচনা আমরা তাদের গবেষণায় খুঁজে পাব। পূর্বের আলোচনায় যেসব ওরিয়েন্টালিস্ট ইসলাম সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিল, তাদের কথার জবাব পরবর্তী ওরিয়েন্টালিস্টের মাধ্যমে আমরা দিচ্ছি। তারাও তো ইসলাম, ইসলামের নবি, কুরআন-হাদিস ও আরো অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের ফলাফল পজিটিভ কীভাবে হলো, এটি প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের কাছে প্রশ্ন থেকে যায়। বিষয়টি এমনও নয় যে, পজিটিভ সমালোচনাকারীগণ মুসলিম। না, বরং তারা খ্রিস্টান বা সাধারণ গবেষক। এটাই হলো বিদ্বেষপূর্ণ আর সত্যানুসন্ধানী গবেষণার ফরাক।

প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে কবি ইকবালের কথাটি স্মরণীয়। তিনি ব্যাঙ্গালোরের মি. জামিলের নিকট ০৪/০৩/১৯৩০ খ্রি. এক চিঠি লিখেন। তাতে তিনি প্রাচ্যবিদদের জ্ঞানের প্রতি নিজের অনির্ভরতা উল্লেখ করে বলেন,

I have little faith in European Oriebtalists whose book are mostly actuated either political propaganda or missionary considerations.

---

৬০. মুহাম্মেডানিযম, পৃ. ৩৩, লন্ডন, ১৯৫৩ ইং।

৬১. দ্য ম্যাকিং হিউমানিটি, পৃ. ২০২।

ওরিয়েন্টালিস্টদের দেশ পরিচয়

ওরিয়েন্টালিস্টদের জন্য দেশের সীমাবদ্ধতা নেই। যে কোন দেশের মানুষ ওরিয়েন্টালিস্ট হতে পারে। আবার যে কোন ধর্মের মানুষও প্রাচ্যবিদ হতে পারে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওরিয়েন্টাল দর্শনের আলোচনা একটু পরেই করছি। আমাদের প্রাথমিক গবেষণায় যেটি উপলব্ধি হয়েছে যে, বেশ কিছু রাষ্ট্র এমন রয়েছে যেখানে ওরিয়েন্টালিস্টদের শক্ত অবস্থান ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আশ্রয়-প্রশ্রয় তাদের দেওয়া হয়। রাষ্ট্র তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম সারিতে যাদের নাম আসে তারা আমাদের অতি পরিচিত। নিম্নে এমন কিছু দেশের আলোচনা এখানে উল্লেখ করছি।

১. ইংল্যান্ড/ব্রিটেন

ইংল্যান্ডের দেশ শাসন করার খ্যাতি-কুখ্যাতি আমাদের জানা আছে। ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লুণ্ঠন-শোষণের কথা আমরা জেনেছি। তবে ওরিয়েন্টালিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্য ধর্মের উপর আঘাত হানার বিষয়টি আমাদের অজানা ছিল। বড় বড় ইসলাম বিদ্বেষী ইংল্যান্ড থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তারা সেখানে ওরিয়েন্টালিজমের পক্ষে কাজ করার মত রাষ্ট্রীয় পরিবেশ পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের সৃষ্টি ওরিয়েন্টালিস্টের অন্যতম হলেন—

A.J.Arberry, A.Geom, H.A.R.Cribb, D.S.Margoliouth I R.S. Nickolson প্রমুখ।

২. আমেরিকা

প্রাচ্যবিদ উৎপাদন ও ইসলামের উপর আঘাত হানার জন্য দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে আমেরিকা। আমেরিকা ইসলামকে অভ্যন্তরিণভাবে দুর্বল করার জন্য ওরিয়েন্টালিস্ট সৃষ্টি করছে। তাদের প্রয়োজনীয় সকল কাজ আনজাম দিচ্ছে। আমেরিকান ঐসব ওরিয়েন্টালিস্টদের অন্যতম হলেন—

K.Cragg, D.B.Macdonald, Jon Maynard I Ph. Hitti প্রমুখ।

৩. ফ্রান্স

মুসলিম সন্তানগণ আজ উচ্চ শিক্ষার জন্যে ফ্রান্স যাচ্ছে, কিন্তু সেই ফ্রান্স থেকেই তৈরী হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী ওরিয়েন্টালিস্ট। ইসলামকে

বিশ্ববাসীর কাছে দর্শনহীন একটি জীবনব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য ফ্রান্সের অবদান স্পষ্ট। ফ্রান্স থেকে যেসব ওরিয়েন্টালিস্ট বের হয়েছেন তাদের তালিকাও বেশ দীর্ঘ। তাদের অন্যতম হলেন—

Baron Carra De Veux, L.Massignon I H.Lammens প্রমুখ।

৪. জার্মান

ইসলামের প্রতি অশ্রদ্ধা, অপপ্রচার ও হিংসা ছড়ানোর ক্ষেত্রে জার্মানের অবদান কম নয়। হিটলারের পরাজয় না হলে জার্মানই পৃথিবীর প্রথম স্থানাধীকারী ওরিয়েন্টালিস্ট রাষ্ট্র হত। জার্মানের অন্যতম ওরিয়েন্টালিস্ট হলেন—

Gold Ziher, G.Von Grunbsum I J.Schacht প্রমুখ।

এছাড়া হাঙ্গেরি, হল্যান্ড, ইন্ডিয়া, ও নেদারল্যান্ডসহ খ্রিস্টান সংখ্যাধিক্য বিভিন্ন দেশে ওরিয়েন্টালিস্টদের সন্ধান পাওয়া যায়।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ওরিয়েন্টালিস্ট

কিছু মুসলিম দেশে মুক্ত চিন্তার নামে মুসলিম নামধারী ভ্রান্ত কিছু লোকদেরকে ওরিয়েন্টালিস্টদের মত কথা ও মতামত ব্যক্ত করতে দেখা যায়। যেমন: ইরাক, মিসর, সিরিয়া, লেবানন, বাংলাদেশ ও আরো অন্যান্য দেশ।

তবে সাধারণ অমুসলিমদের সমালোচনা থেকে মুসলিম ওরিয়েন্টালিস্টদের সমালোচনা অত্যন্ত বিপদজনক। মানগতভাবে বা সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোন ন্যায়-নীতি অবলম্বন করা হয়নি। তথ্য-উপাত্তেরও রয়েছে ভুল ও মিথ্যা সন্নিবেশন। তাদের উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়। তারা কতটা বিদ্বেষ আর অন্ধত্ব নিয়ে ইসলাম, মুসলিম, কুরআন, হাদিস, ও ইসলামের নবি সম্পর্কে সমালোচনায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসুন এই কামনা করছি।

ধর্মভিত্তিক ওরিয়েন্টালিজম

পৃথিবীতে ওরিয়েন্টালিজম পোষণ করছে যে শ্রেণি, তাদের বড় অংশটি হলো পূর্বেকার দুটি আসমানি ধর্মের অনুসারী ইহুদি-খ্রিস্টান। ইসলামের

ব্যাপারে তাদের সমালোচনাগুলো আমাদের চোখে পরে বেশি। ইসলাম সম্পর্কে তাদের নানা চিন্তা-চেতনা ও গবেষণা পুস্তাকারে বইয়ের দোকানগুলোতে দেখা যায়। কোন কোন বইতে তো তারা মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তাদের আপত্তিগুলো খণ্ডন করতে। যদিও তাদের ঐ সব আপত্তি ও সমালোচনার বস্তুনিষ্ঠ সমাধান পেশ করা হয়েছে। তথাপি উদ্ভ্রান্ততাই তাদের কাছে পছন্দনীয়। তাই ইসলামের বাণী তাদের অন্তরে শান্তির ছায়া দান করতে পারেনি। তারা ভ্রান্তই থেকে গেছেন।

ইহুদি-খ্রিস্টাদের পাশাপাশি হিন্দু-বৌদ্ধ সমালোচকদের কিছু আপত্তি দেখা যায়; কিন্তু অন্যদের মত তাদের একেশ্বরহীনতা ও আসমানি কিতাব না থাকার কারণে ধর্ম-বিশ্বাস পুরোটাই ইসলাম বিরোধী। পাশাপাশি ইহুদি-খ্রিস্টনদের ধর্মমতেরও বিরোধী। তবে হিন্দু-বৌদ্ধ তথা মুশরিকশ্রেণির সমালোচকদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের সমালোচনাগুলোও তেমন তাত্ত্বিক নয়। নিজেদের মতের বিপরীত হলে মানুষ যা বলে– তা-ই তাদের সমালোচনার মূল উপকরণ।

ইসলামকে সমালোচিত করার জন্য এখন পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো এককভাবে কাজ করছে। বাহ্যিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর উপর সন্ত্রাস নামের তোকমা বসাচ্ছে। চাপিয়ে দিচ্ছে গৃহযুদ্ধ বা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। অন্যথায় দলাদলির মাধ্যমে বিভক্ত করা হচ্ছে আমজনতা ও ইসলামি জ্ঞানী সমাজকে। আমাদেরকে সার্বক্ষণিক তাদের অপকর্ম ও অপপ্রচারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। ইসলাম ও মুসলিমদের ইয্যত-সম্মান রক্ষা করুন।

মুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট

অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্টদের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্যের আহ্বানে অনেকে সাড়া দিয়েছেন। তারাও একসময় অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট ছিলেন। গবেষণা আর পর্যালোচনা তাদেরকে সত্যের আলো দেখিয়েছে। জেনে শুনে ইসলামকে তারা নিজের ব্যক্তি জীবনে স্বীকার করে নিয়েছেন। ত্যাগ করেছেন খ্রিস্টধর্ম। এমন কয়েকজন ওরিয়েন্টালিস্টদের আলোচনা আমরা এখন করবো। তাদের পরিচয় এ

কথা প্রমাণ করে দিবে যে, সত্যানুসন্ধানী হলে যে কেউ অবশ্যই ইসলামকে বুঝতে সক্ষম হবে।

মুসলিম ওরিয়েন্টালিস্টদের অন্যতম হলেন, ফ্রান্সের নাসির উদ্দিন ডিনেট। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আলফন্স ইটিন ডিনেট।

ওরিয়েন্টালিস্টদের বিভ্রান্তির কারণ

পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্ট বা অন্য যে কোন প্রাচ্যবিদ ইসলাম-মুসলিম, কুরআন-হাদিস নিয়ে গবেষণা করে একটি বস্তুনিষ্ঠ ফলাফল দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তাদেরকে আমরা আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। ইসলাম, কুরআন-হাদিস ও ইসলামের নবিকে ভাবার জন্য এবং তাকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। হতে পারে তাদের গবেষণার ফলে একদিন সঠিক পথ ও ইসলামের মর্মবাণী বুঝে আসবে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতে তারা স্থান করে নিবেন।

ইসলাম একমাত্র সুনিপুণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম এসেছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। ইসলাম ও ইসলামের নবি সকলের। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কুরআন সকল মানুষের জন্য। কুরআন সকলের জন্য হিদায়তরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসুলের হাদিস সকলের জন্য উন্মুক্ত। রাসুল শুধু আরবি নবি নন, বিশ্বনবি। ইসলামের বাণী বহন করে কুরআন ও হাদিস। আর উভয়টি মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য গাইড বুক।

অমুসলিমগণ কুরআন-হাদিস ও ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে গবেষণা করছে এবং গবেষণাপত্রে তাদের নানা রকম মতামত ও ফলাফল উঠে আসছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে সাধারণ ও উদ্দেশ্যহীন সত্যানুসন্ধানী মনে হলেও গভীর বিশ্লেষণে অন্য তথ্য বের হয়ে আসে। তাদের গবেষণায় দুটি মেরুকরণ তৈরী হয়। চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায়, তারা একই পথে ভিন্ন গন্তব্যের দিকে ছুটছেন। ফলে সঠিক পথে পৌঁছানো বাহ্যিক দৃষ্টিতে সহজ ভাবা হলেও বাস্তবতা অনেক দুরূহ ব্যাপার।

ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণা ও পর্যালোচনা দেখে আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রাচ্যবিদগণ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত—

১. উদ্দেশ্য প্রণোদিত গবেষণা ও গবেষকশ্রেণি
২. সত্যানুসন্ধানী গবেষণা ও গবেষকশ্রেণি

প্রথম শ্রেণির গবেষণা ও গবেষক

প্রথম শ্রেণি, অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত গবেষণা ও গবেষকগণ একটি ভিন্ন স্রোতে পথ চলতে চান; কিন্তু তা অতি সংগোপনে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখে কেউ ভাববে না— তাদের ও তাদের গবেষণার মাঝে কোন বিভ্রান্তি আছে; বরং তাকে সবাই সমাদর করবে। নিজেদের ভাববে। সে যে বিশেষ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে তা কেউ বুঝে উঠতে পারে না। তার কথাগুলো বিশ্লেষণপূর্ণ, তবে অতি সূক্ষ্মভাবে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

এ শ্রেণির ওরিয়েন্টালিস্টগণ নানান এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে থাকেন। কখনো ধর্মীয় কারণে আবার কখনো ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কারণে উদ্দেশ্যপূর্ণ গবেষণার কাজে হাত দেন।

প্রথম ধাপ : মিশনারি তৎপরতা

ইহুদি-খ্রিস্টানদের একটি শ্রেণি রয়েছে, যারা তাদের ধর্মের সহযোগিতার লক্ষ্যে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। পূর্বেকার সময় গীর্জার পাদ্রীগণ এ কাজের দায়িত্ব নিতেন। ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা খ্রিস্টানদের বুঝাতেন। সাধারণ খ্রিস্টানদের মুসলিমদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। এজন্য তারা দেশে দেশে ধর্ম প্রচারের নামে ইসলামের বিকৃত ঘটানোর জন্য মিশনারি মিশন পরিচালনা করত। তারা অতি সংগোপনে এ কাজ করত। এক সময় মিশনারি অনেক কার্যকরী হলেও পরবর্তীতে তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে পাদ্রীরা তাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করেন।

দ্বিতীয় ধাপ : খ্রিস্টানদের পরিচালনায় মাদরাসা

ইসলামের বিকৃতি সাধন ও কুরআন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা সাধারণ খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মাঝে তুলে ধরার জন্য নিজেরাই তৈরি করেন ইসলামি মাদরাসা। মুসলিমদের মতই অভিন্ন কুরআন-হাদিসের পাঠদান করা হবে; তবে ব্যাখ্যা করা হতো নিজেদের উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস অনুপাতে। সব

কিছুকে বুঝানো হতো বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ করে। বিভ্রান্তিকর মাদরাসার ছাত্ররাই পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে এসে মুসলিমদের মাঝে গিয়ে মুসলিমদের সরলতা ও উদারতার সুযোগে সঠিক ইসলামি বিদ্যার শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করত। মসজিদের ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করত। অমুসলিম রাষ্ট্রের গুপ্তচর হিসাবেও কাজ করত। বিশেষ শ্রেণির অমুসলিম নারী-পুরুষকে এ কাজে নিয়োগ করা হত। এদেরকে দেখে মনে হতো তারাই প্রকৃত মুসলিম। তাদের স্বাভাবিক চলা-ফেরার ছিল মুসলিমদের সাধারণ রীতি-আচার। চতুরতা দিয়ে মুসলিমদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে তাদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল। কুরআন-হাদিসের উপর আঘাত করার পাশাপাশি তখনকার ওরিয়েন্টালিস্টের অন্যতম টার্গেট ছিল মুসলিম ও ইসলামি রাষ্ট্রকে দুর্বল করা। তাই মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়া ওরিয়েন্টালিস্টদের গুপ্তচর বৃত্তির কাজে নিয়োগ করা হয়। এ কাজে তারা দক্ষতার পরিচয় দেয়। মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে। আমির-উমরা ও উজির-নাজিরদেরকে ক্ষমতা ও নারীর লোভ-টোপ বিভাজনে লিপ্ত করে। এই পদ্ধতি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর যুগসহ আরো কয়েকশ বছর পরিচালিত হয়। আর এখনো ইসলামি নেতাদের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া ব্যবহার করছে পশ্চিমাবিশ্ব।

তৃতীয় ধাপ : আধুনিক ওরিয়েন্টাল সিস্টেম

আধুনিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। তারা ইসলামের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলাদা চর্চা শুরু করে। আধুনিক যুগে ইসলামকে আঘাত করার জন্য ওরিয়েন্টালিস্টগণ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেন। এ ধাপগুলো হলো—

১. ইসলামি স্টাডি ও বিষোদ্গার
২. ইসলামি পাণ্ডুলিপি পাচার
৩. ইসলামি স্টাডির নামে ফ্যাকালটি খোলা
৪. ইসলামি দেশে প্রফেসর ও গবেষক হিসাবে নিয়োগ লাভ

১. ইসলামি স্টাডি ও বিষোদ্গার

পরবর্তীতে গোপনীয়তা ও মারমুখী পথ পরিহার করে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রকাশ্যে আসার পথ খুঁজতে থাকেন। আবিস্কার করা হলো নতুন পদ্ধতি। নিজেদের আধুনিক নাম দিলেন ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদ। নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় গোপন রাখলেন। আরব দেশগুলোতে এসে তারা ইসলামি বিষয়গুলো নিয়ে পড়ালেখা বা স্টাডি শুরু করলেন।

২. ইসলামি পাণ্ডুলিপি পাচার

ওরিয়ান্টালিস্টার আরবি ও ইসলামি পাণ্ডুলিপির উপর শকুনী দৃষ্টি বসালেন, আর আস্তে আস্তে নিজ নিজ দেশে পাচার করতে থাকেন মুল্যবান সব পাণ্ডুলিপি। কোন কোন সময় মূল পাণ্ডুলিপি অন্যায়ভাবে পাচার করেছেন। আবার কখনো বৈধ পন্থায় কপি করে নিয়েছেন।

এভাবে পশ্চিমাদের দেশে ইসলামি পুরাতন পাণ্ডুলিপির সংগ্রহশালা তৈরী হলো। কিছু পাণ্ডুলিপি তারা নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা ও ভূমিকাসহ প্রকাশ করতে লাগলো। অনেক ইসলামি গবেষণাপত্র তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি ও প্রকাশ করতে সক্ষম হন।

৩. ইসলামি স্টাডির নামে ফ্যাকালটি খোলা

ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণা আরো ত্বরান্বিত হয়। পুরাতন ভার্সিটিগুলোতে ইসলামি স্টাডির নামে আলাদা ডিপার্টমেন্ট খোলে। ইউরোপ ও পশ্চিমাদের কোন কোন ভার্সিটিতে আরো অগ্রসর হয়ে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস ও আরবিভাষা প্রভৃতি দিয়ে আলাদা আলাদা ডিপার্টেমেন্ট খোলা হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলামের প্রতি তাদের উদার মনোভাব ও গবেষণা করে ইসলামকে বুঝার একটি বাস্তব নমুনা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যপূর্ণ গবেষণা আরো শানিত হয়।

তারা এমন এক পর্যায়ে পৌছালো যে, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহসটুকু আমাদের অনেকে হারিয়ে ফেললো। কারণ, মুসলিমদের অনেকেই ঐসব ওরিয়েন্টালিস্টদের অন্ধভক্ত ও অনুসারী বনে গিয়েছিল। তাদের বিপরীতে কোন প্রকার সমালোচনা শুনতে তারা নারাজ। প্রাচ্যবিদগণ এতে প্রশংসনীয় মর্যাদায় সমাসীন হয়। মুসলিমদের মাঝে

একটি অবস্থান তৈরি করতে তারা সক্ষম হয়। তাদের ইসলামি স্টাডি চলতে থাকে।

তাদের তৈরী ইসলামি ফ্যাকালটি ও ভার্সিটি থেকে নানা গবেষণাপত্র ও বিশ্বকোষ প্রকাশ পেতে থাকে। এসব গবেষণাপত্র ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া, ইসলামি হিস্টোরি, ইসলামি লিটারেচার, অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ ও ইসলামি সুফিজম প্রভৃতি নামে মুসলিমদের হাতে আসতে থাকে। এগুলো মুসলিমদের ভার্সিটির সিলেবাস হিসাবে জায়গা করে নিল। আবার কোনটা সামনে রেখে মুসলিম দেশের ইসলামি স্টাডির বই লেখা হলো। নতুন নামে ইসলামি স্টাডির বই ছাপানো হলেও তা ছিল ওরিয়েন্টালিস্টদের মন্তব্য ও মতবাদ প্রচারের নতুন লেবেল। কারণ, ইসলামি স্টাডি বইগুলোর রেফারেন্সবুক ছিল তথাকথিত এনসাইক্লোপিডিয়া ও অন্যান্য ওরিয়েন্টালিস্টদের গ্রন্থাবলি।

ওরিয়েন্টালিস্টদের গোপন অভিসন্ধি আরো কয়েক ধাপ সফল হলো, যখন মুসলিম ছাত্রগণ ইসলামিক ল, ইসলামিক হিস্টোরি ও ইসলামি স্টাডির উপর ডিগ্রি নেওয়ার জন্য তাদের নির্মিত ভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হন এবং ডিগ্রি লাভ করেন। নিজেকে প্রকৃত শিক্ষিত মনে করেন। দেশে এসে গর্বের সঙ্গে আপন ডিগ্রির কথা প্রচার করেন। আর প্রাচ্যবিদদের লেখা বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ দিয়ে ইসলামি ভাব-ধারার তুলনা করেন। নিজেদের অজান্তে তারাও এক প্রকার ওরিয়েন্টালিস্ট হয়ে যান।

৪. ইসলামি দেশে প্রফেসর ও গবেষক হিসাবে নিয়োগ লাভ

ওরিয়েন্টালিস্টদের অন্য আরেকটি টার্গেট হলো, ইসলামি স্টাডি করে তারা মুসলিম দেশগুলোর ইসলামি স্টাডি বিভাগের অধ্যাপনার দায়িত্ব নেওয়া। এক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল। মুসলিম দেশে সরকারি ও বেসরকারি অনেক ইউনিভার্সিটিতে অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্টেদের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ফলে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ সুযোগ বুঝে আপন চিন্তা-ধারা অনুযায়ী বিষ মাখানো ইসলামি জ্ঞান পাঠ দান করতে থাকেন। ইসলাম ও ইসলামি আদর্শকে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। আবার কখনো নিজেদের মত করে ইসলামি বিধি-বিধান ও আদর্শ ব্যক্ত করেন। ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রথম শ্রেণির আলোচনা এখানে শেষ করছি।

সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার ইচ্ছে থাকলেও বিষয়টির ডাল-পালা অনেক গজিয়েছে। তাই কিছুটা হলেও বিশ্লেষণ করা জরুরি ছিল। তবে শেষ কথাটি না বললেই নয়। এই শ্রেণির ওরিয়েন্টালিস্টগণ কোন দিনই সত্য অনুসন্ধান করে পাবে না। কারণ, তারা একই পথে হাঁটলেও গন্তব্যে পৌঁছার ইচ্ছে তাদের নেই; বরং সত্যকে গোপন ও বিকৃত করাই তাদের প্রধান টার্গেট। সুতরাং ইসলাম বুঝার জন্য তাদের বিভ্রান্তিকর গবেষণা পরিহার করুন। আল্লাহ প্রেরিত কুরআনে কারিম পড়ুন এবং রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস স্টাডি করুন। ব্যাখ্যার জন্য ইসলামের অনুসারী আলেম-ওলামার শরানাপন্ন হোন। কেন মুসলিম স্কলার থাকতে অমুসলিমদের কাছে ইসলাম বুঝার জন্য যাবেন? যে নিজেই ইসলাম সত্য ধর্ম মনে করে না, সে অন্যের কাছে সত্য বলে প্রমাণ করবে কীভাবে?

দ্বিতীয় শ্রেণির গবেষণা ও গবেষক

ওরিয়েন্টালিস্টদের দ্বিতীয় শ্রেণি তথা সত্যানুসন্ধানী গবেষণা ও গবেষকদের আলোচনা এখানে করবো। এ শ্রেণির ওরিয়েন্টালিস্টগণ বিশেষ কোন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেন না। তারা মূলত নিজ আগ্রহে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেন। লোক মুখে ইসলাম, নবি, কুরআন, হাদিস, ইসলামি ইতিহাস, ইসলামি সভ্যতা ও আরব প্রভৃতি নিয়ে নানা কথা, সমালোচনা শোনেন; কিন্তু বাস্তববাদী ও সত্যানুসন্ধানী হওয়ার দরুন তারা কান কথায় বিশ্বাস না করে মূল উৎস থেকে ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করেন। কুরআন-হাদিস, ফিক্‌হ ও ইতিহাস নিয়ে স্টাডি করেন।

এ ধরনের ওরিয়েন্টালিস্টদের সংখ্যা যদিও এক সময় তুলনামূলক কম ছিল, কিন্তু এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইউরোপের সাধারণ মানুষ এখন ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রহী। তাই ইসলাম, কুরআন-হাদিস ও ইসলামের নবি নিয়ে ভাবনা নতুন করে শুরু হয়েছে; তবে এক্ষেত্রে তারা সঠিক গবেষণা ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে তারা সত্যানুসন্ধানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে

সত্যানুসন্ধান করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কেন তারা সত্যের অনুসন্ধান করতে পারছেন না তা আমরা বিশ্লেষণ করবো।

আমাদের পর্যালোচনা হিসাবে যেসব কারণে উপরিউক্ত ওরিয়েন্টালিস্টগণ বিভ্রান্তির শিকার হন তা হলো—

১. সঠিক উপাত্ত-উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ না করা। ওরিয়েন্টালিস্টদের একটি বিশাল অংশ ইসলামের সঠিক উৎস কি তাই জানে না। ইসলাম ধর্ম কোন্ নীতি-আদর্শের মাধ্যমে পরিচালিত তা তাদের অজানা। এজন্য তারা প্রায়ই সিদ্ধান্তে বিভ্রান্তির শিকার হন।

২. বিদ্বেষী ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণাপত্র নির্ভর স্টাডি বিভ্রান্ত হওয়ার অন্যতম উপকরণ। সত্যানুসন্ধানী ওরিয়েন্টালিস্টদের বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, তারা ইসলাম বিরোধী ওরিয়েন্টালিস্টদের ভ্রান্ত ও বিকৃত ইসলামি গ্রন্থগুলো আপন স্টাডির মূল উপজীব্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে সত্য তথ্যগুলো তাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ইসলামের মৌলবাণী থেকে দূরে অবস্থান করেন।

৩. কুরআন-হাদিসের মৌলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। ইসলাম একটি শাশ্বত ধর্ম। এটি মানবতার ধর্ম। প্রলয় দিবস পর্যন্ত এ ধর্ম মানব জীবনব্যবস্থা হিসাবে অবধারিত থাকবে। প্রয়োজন বোধে নানা প্রকার আইন প্রণয়ন ও সংস্করণ দরকার হবে। আর এগুলো করা হবে কুরআন-হাদিসের মৌলিক নীতির আলোকে, যাকে ইসলামি শরিয়ার ভাষায় বলা হয় উসুলে ফিক্হ।

৪. ভাষার অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া। ওরিয়েন্টালিস্টদের শতকরা নিরানব্বই ভাগই আরবিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত নন। অন্য দিকে কুরআন-হাদিসের মর্মবাণী বুঝার জন্য আরবিভাষার বিষয়টি প্রথমে চলে আসে। আরবিভাষার জ্ঞানের মাধ্যমে কুরআন-হাদিস ও ফিক্হ থেকে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস, জীবন-চলাচল ও রীতি-নীতি জানা সম্ভব হবে; কিন্তু যখন ভাষাজ্ঞানে অজ্ঞতা বা দুর্বলতা থাকবে, তখন প্রকৃত আলোচনা ও সঠিক বিশ্লেষণ অজানা থেকে যাবে। ফলে যে উদ্দেশ্যে গবেষণা করা হচ্ছে তা ফলপ্রসূ হবে না। বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে যাবে। পথের দিশা নয়, বরং পথহারা হবে।

৫. ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা সামগ্রিকভাবে ওরিয়েন্টালিস্টদের ভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ হলো, তারা তাদের সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে ভুল ইনফরমেশন ও অপপ্রচারের শিকার হন। তাদের কাছে ইসলামের ভিন্ন ইমেজ তৈরি করা হয়। প্রকৃত ইসলাম তাদের থেকে আড়ালে থেকে যায়। ফলে ইসলাম হয়ে যায় তাদের কল্পিত একটি রূপ। যার মাঝে ভাল কিছু তারা দেখতে পায় না।

ওরিয়েন্টালিস্টদের বিষয় ভিত্তিক গবেষণা

ওরিয়েন্টালিস্টগণ বিষয় ভিত্তিক গবেষণা করে থাকেন। ইসলামি জ্ঞানের বিষয়গুলোর উপর পারদর্শিতা অর্জনের জন্য আলাদা স্কলার ঠিক করে। তারা বিষয়ভিত্তিক গবেষণা করে থিসিস ও গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে থাকে। তাদের বিষয়ভিত্তিক গবেষণা হয় নানা বিষয়ে। তার মধ্যে অন্যতম হল—

১. কুরআনের ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা সৃষ্টি ও রাসুলের সৃষ্টি বলে প্রমাণ করা

২. হাদিসের অশুদ্ধতা প্রমাণ করা

৩. ফিক্‌হের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রোমান আইন হিসাবে প্রমাণ করা

৪. মুসলিম ইতিহাসের ব্যাপারে নির্ভরতাহীন ও অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করা

৫. রাসুলের জীবন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অন্যায় ও অপবাদমূলক আলোচনা উপস্থাপন করা

৬. রাসুলের সাহাবিদের জীবন-চরিত নিয়ে মিথ্যা সমালোচনা করা

৭. ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে অযৌক্তিক আলোচনা পেশ করা

৮. আরবিভাষার উপর নানান পর্যালোচনা পেশ করে তার ভাষাগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর উপর ওরিয়েন্টালিস্টগণ তাদের অসংখ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে, যা সাধারণ মুসলিম ও অমুসলিম সকলের মাঝে ভাইরাল হয়েছে। সত্য-মিথ্যার ক্ষেত্রে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মনে হলেও ঐসব গবেষণাপত্র সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। কেউ তাদের সমালোচনা

করতে নারাজ; বরং প্রশংসা করাটাই নিজেদের দায়িত্ব হিসাবে জ্ঞান করছে। ওরিয়েন্টালিস্টদের ব্যাপারে এরকম উদার দৃষ্টি মুসলিমদেরকে আরো ভবিষ্যত সমস্যা ও উৎকণ্ঠার মাঝে নিপতিত করেছে।

বিভ্রান্তিকর গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি প্রদান শিক্ষাগত অপরাধ

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের রচনালির ব্যাপারে একজন মুসলমানের সতর্ক থাকা আব্যশক। নতুবা আমরা ইসলাম, মুসলিম ও ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক বিড়ম্বনায় পতিত হবো। আমার দেখা কলেজ-ভার্সিটির মুদ্রিত বইগুলোর বিভ্রান্তির মূল কারণ এখানে। তারা ইসলাম-মুসলিম সম্পর্কে যে তথ্য উপস্থাপন করেন তা ঐসব প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থাবলি থেকেই। যা মিথ্যা, অসত্য, বিভ্রান্তিপূর্ণ ও অমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভরপুর। আর এসব বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণই তারা মানিক্য-জহরত মনে করে আপন বইয়ে সন্নিবেশন করেন, যা এক রকম শিক্ষাগত অপরাধ। কারণ, আপনি যদি ধর্ম, মতবাদ ও ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চান তাহলে প্রথতে তাদের রচিত গ্রন্থাবলি দেখুন; তাহলে তাদের সঠিক আকিদা-বিশ্বাস ও আদর্শ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারবেন। আর এটাই গবেষণার মূল সূত্র। এর মাঝে বিচ্যুতি হলে গবেষণায় বিচ্যুতি দেখা দিবে। গবেষক, পাঠক ও শিক্ষার্থী সকলেই বিভ্রান্তির শিকার হবেন। আর আজকের মুসলিমদের উদিয়মান প্রজন্ম কলেজ-ভার্সিটিতে সেই সমস্যায় নিপতিত হচ্ছেন।

এই বইয়ে উল্লিখিত ওরিয়েন্টালিস্টেদের বিবরণ

১. বাতরাস মুহতারাম (Pierrele Aènèrè)
২. জেরারড কারিমন (Gèrard de Grèmone)
৩. ডি এস মার্গলিউথ (D.S.Margoliouth)
৪. গোল্ড যিহার (Gold Ziher)
৫. জারবার্ট (Jerbert)
৬. জে. স্কচ্ট (J. Schocht)
৭. টমাস ওয়াকার আর্নল্ড (Thomas Walker Arnold)
৮. আলফন্স ইটিন ডিনেট (Alphonse Etienne Dinet)

৯. এস. এম. জিমার (S. M. Zweimer)
১০. হার্ফোর্ড (Hartford)
১১. কে. ক্র্যাগ (K. Cragg)
১২. এ. জে. আরবেরি (A. J. Arberry)
১৩. এ. জিয়োম (A. Geom)
১৪. ব্যরন ক্যারেড ভক্স (Baron Carrade Vaux)
১৫. এইচ. এ. আর. জিব (H. A. R. Gibb)
১৬. জন মেনার্ড (John Maynard)
১৭. জি. ভন গ্রাহাম (G. Von Grunbaum)
১৮. পি. এইচ. হিট্টি (P. H. Hitti)
১৯. এ. জে. ওয়েনসিংক (A. J. Wensink)
২০. এল. ম্যাসিনন (L. Massignon)
২১. ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড (D. B. Macdonald)
২২. এম. গ্রিন (M. Green)
২৩. আর. এ. নিকলসন (R. A. Nickolson)
২৪. হারফুলি হোল
২৫. এইচ. ল্যামেন্স (H. Lammens)
২৬. এ. টনবি (A. Toynbee)
২৭. ডব্লিউ. মুর (W. Muir)
২৮. ডি. এম ডোনাল্ডসন (D. M. Donaldson)
২৯. বিশাপ টারপিন (Bishop Turpin)
৩০. আর্থার জেস্ক্র (Arthur Jcffry)
৩১. আর. বেল (R. Bell)
৩২. আরএক ব্যাটমান
৩৩. কার্ল ব্রোকেলম্যান (Carl Brocklemann)
৩৪. প্রফেসর মায়ুর
৩৫. প্রফেসর আন্ডারসন

৩৬. প্রফেসর রোবসুন
৩৭. হেনরিক স্যামুয়েল নেবার্গ (Henrik Samuel Nyberg)
৩৮. এডমন্ড হেনরি হানম্যান অ্যালেনবাই (Edmund Henry Hynman Allenby)
৩৯. গুস্তাভ লি বন (Gustave Le Bon)
৪০. আর. এল. বেলাশির

আরো কিছু ওরিয়েন্টালিস্ট

1. N. J. Coulson এন জে কলসন
2. W. M. Watt ডব্লিউ. এম. ওয়াট
3. J. A. Bellamy জে. এ. বেলামি
4. R. Paret আর. প্যারেট
5. G. Bargstrasser জি. বার্গস্ট্রাসার
6. Theodoer Noldeke থিউডর নলডেক
7. Thomas Van Erpenius টমাস ভ্যান আরপেনিয়াস
8. Evariste Levi-Provencal এভারিট লেভি প্রভেনসাল
9. H. H. Brou এইচ. এইচ. ব্রো
10. Boodly বুডলি
11. Frant Buhl ফ্রান্ট বুল
12. K. H. Becker কে. এইচ. বেকার
13. Danial Torman ডানিয়াল টরম্যান
14. Reinhart Pieter Anne Dozy রেইনহাট পিটার অ্যান ডজি
15. Siderskey সিডারসকি
16. Louis Pierre, Eugene, Amelie Sedillot লুইস পিয়ার ইউজি এমিলি স্যাডিলট
17. George Sale জর্জ সেইল
18. J. Wellhausen জে ওয়েলহসেন
19. Kazanova কাজানোভা

20. B. Kazimirski বি. কাজিমিরসকি
21. G. Lebon জি. লেবন

ওরিয়েন্টালিজমের ব্যাপারে মিসর ইফতাবোর্ডের নির্দেশনা

১. শক্তভাবে তাদের মুখামুখী হওয়া

মুসলিমদের পক্ষ থেকে ওরিয়েন্টালিস্টদের মুখোমুখি অবস্থান শুধু চ্যালেঞ্জ করার লেভেলেই থাকেনি, বরং তা ছাড়িয়ে গেছে। ইসলামি চিন্তা এইসব প্রবণতাকে শুধু পরাজিত-ই করেনি, সম্পূর্ণভাবে বিলীন করেছে। যেহেতু এ মোকবেলা কেবল জ্ঞাননির্ভর, তাই ইসলাম ঐসব জ্ঞানের হাতিয়ার দিয়েই এর মোকাবেলা ও পরিচালনা করেছে।

এত বছর পর দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস আবার আমাদের আরেকটি পুরনো মোকাবেলার মুখোমুখি করেছে, যা একই সাথে চিন্তা ও বুদ্ধির যুদ্ধ।

২. ওরিয়েন্টালিস্টদের এ যুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে অবশ্যই ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও গভীরভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এই বাস্তবতা ওরিয়েন্টলিস্টদের কলম ধরার আগে হাজার বার চিন্তা করে নিতে বাধ্য করবে।

৩. ওরিয়েন্টালিস্টরা আমাদের অতীত গৌরব ও বর্তমান পতন নিয়ে কটাক্ষ করে বা করবে। এই কটাক্ষ আমাদের আবার ভাবতে, জ্ঞান অর্জন করতে ও ঘুরে দাঁড়াতে উৎসাহিত করবে।

আমাদেরকে আমাদের অবস্থান বদল করতে হবে এবং তা করতে হবে চিন্তার পরিবর্তনের মাধ্যমে। আমাদের সম্পদ কম বলে আমরা অনগ্রসর নই। আমাদের অনাগ্রসরতার কারণ, আমাদের চিন্তা ও উদ্যোগের অভাব।

৪. আমাদের অবশ্যই ওরিয়েন্টালিজমকে সঠিক ও গভীরভাবে জানতে হবে।

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ওরিয়েন্টালিস্টদের লেখা এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে তথ্য তা নিয়ে আমাদের এখন উচিত একটি আরবি ও ইউরোপিয়ান ভাষার আমাদের নিজস্ব ইসলামিক এনসাইক্লোপিডিয়া লেখার। এতে এ্যারাবিক ও ইসলামিক শিক্ষার সকল দিক ও শাখার শিক্ষা থাকবে।

৬. আমাদের একটি বৈশ্বিক বিজ্ঞান সম্মত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে হবে, যা কোন নির্দিষ্ট দেশ, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকবে না। এর প্রথম ও একমাত্র আনুগত্য থাকবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

৭. আমাদের অবশ্যই একটি বৈশ্বিক মিশনারি প্রতিষ্ঠান থাকবে। এর দ্বারা আমরা বুঝাতে চাই, একটি প্রতিষ্ঠান যা প্রথমত অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলামের আহ্বান করবে। দ্বিতীয়ত নওমুসলিমদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে ও তৃতীয়ত মুসলিমদের রক্ষা করবে। এ প্রতিষ্ঠান আরবি ও ইসলামিক বইগুলো অন্যান্য ভাষায় প্রকাশ করবে এবং বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইসলামকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পেশ করবে।

৮. আমাদের অবশ্যই কুরআনের একটি প্রচলিত অনুবাদ তৈরি করতে হবে– পৃথিবীর সব প্রচলিত ভাষায়, যাতে ওরিয়েন্টালিস্টগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যে ভরপুর কুরআনের বর্তমান প্রচলিত ভ্রান্ত অনুবাদ বাতিল হয়ে যায়। এর সাথে আমাদের প্রচুর পরিমাণে হাদিসও অনুবাদ করতে হবে। আরবি না জানা মুসলিম ও অমুসলিমদের পড়ানোর জন্য।

৯. আমাদের অবশ্যই ইসলামি ঐতিহ্যকে কুসংস্কার মুক্ত করতে হবে ও এর কাহিনিসমূহকে অলিক বর্ণনা থেকে মুক্ত করতে হবে।

১০. ইসলামিক বিশ্বের বাহিরে আরবি ও ইসলামি বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে। এর জন্য ইসলামিক রাষ্ট্রগুলো থেকে সুশিক্ষিত প্রফেসরদের ওরিয়েন্টালিস্টদের দূর্গ ইউরোপ-আমেরিকায় পাঠাতে হবে। এর ফলেই শুধু স্লোগানের জোরে নয়, বরং বৈজ্ঞানিক চেষ্টার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপিয়ানদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা সম্ভব হবে।[৬২]

সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য করণীয়

স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির ভাইদেরকে কন্টকাকীর্ণ ধারণা হতে উত্তরণের জন্য করণীয় :

---

৬২. 'Orientalism' Dar Al-Ifta Al-Missriyyah.

প্রথমত : আমাদের কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষার পরিচর্যাকারী শিক্ষকমণ্ডলীকে সর্তক ও সচেতন হতে হবে। গবেষণাকে আপন মতাদর্শের অনুকূলে আনার চেষ্টা না করে বাস্তবতার আঙ্গিকে লেখার প্রয়াস চালাতে হবে।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষার্থীদের সচেতনতার সাথে পাঠ্যবই সংগ্রহ করতে হবে। বাজারে বই আসলেই তা সংগ্রহ করা চলবে না। আর কোনো বইয়ে উদ্ধৃতি থাকলেই তা সত্য, বাস্তবতা কিংবা অহি হয়ে যায় না; বরং দেখতে হবে— ঐ উদ্ধৃতি আসল বইটিতে আছে কি-না, থাকলে তিনি কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন, এর বাস্তবতা কতটুকু। এটি কী অস্বীকৃত মন্তব্য, নাকি মনগড়া সিদ্ধান্ত।

তৃতীয়ত : ইসলাম ও তার আদর্শ সম্পর্কে আমাদের কলেজ-ভার্সিটিতে খুব কম জানার সুযোগ থাকে; যার কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা ইসলাম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকে। তারা মনে করে ইসলাম হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমাদানে এক মাসের রোজা, ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার দুই ইদ— এই আর কী। তাদের কাছে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ না। ইসলামকে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগীও মনে করে না।

এজন্য আমাদের শিক্ষার্থী ভাইদের এই শূন্যতা পূর্ণ করতে হবে। কুরআন পাঠ ও অধ্যয়ন করতে হবে। তাফসির পড়তে হবে এবং হাদিস জানতে হবে। ইসলামি জীবনব্যবস্থা জানার জন্য ফিক্‌হ অধ্যয়ন করতে হবে। আত্মশুদ্ধির জন্য শাইখদের কাছে যেতে হবে। আর ঐসব প্রাচ্যের পণ্ডিতদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাদের উত্থাপিত বাতিল প্রশ্ন ও মন্তব্যের জবাব জানতে হবে। এজন্য আলেম-ওলামাদের বই অধ্যয়ন করতে হবে।

পাঠকের সহায়ক গ্রন্থাবলি

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের বিভ্রান্তি হতে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমরা আরো কিছু বই দেখতে পারি। কিছু বইয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

١- الإسلام والمستشرقون لأبي علي الندوي.

٢- ظاهرة إنتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها لمحمد فتح الله الزيادي.

٣- الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال الإستشراق للدكتور عبد الرحمن عميرة.
٤- الردّ على المستشرق اليهودي جولد تسهير في مطاعنة على القرآت القرآنية للدكتور محمد حسن حسن جبل.
٥- دفاع عن السنّة-ورد الشبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين وبيان الشبهة الواردة على السنّة قديمًا وحديثا وردًا علميًا وصحيحا للدكتور محمد بن محمد أبي شبهة.
٦- الإستشراق في السيرة النبوية لعبد الله محمد الأمين النعيم.
٧- الإستشراق والخليفة الفكرية للصراعي الحضاري للدكتور محمود حمدي زقذوق.
٨- إسلاميات اور مغربي مستشرقين و مسلمان مصنفين للشيخ الأستاذ الكبير أبي الحسن على الندوي.
٩- إستشراق و المستشرقون للدكتور مصطفى السباعي.
١٠- السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور المذكور.
١١- أنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنّة من الخطل والتضليل والمجازفة للعلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني.
١٢- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور الأعظمى.
١٣- الإستشراق ومكانته بين المذاهب الفكرية المعاصرة للدكتور مازد صلاح مطبقانئ.
١٤- الرسول في الدراسات الإستشراقية المنصفة للمحمد شريف الشيباني.
١٥- جهود الإستشراق الروسى في مجال السنّة والسيرة للدكتور سليمان بن محمد الجارالله.

১৬- مجموعة بحوث حول القرآن في الدراسات الإستشراقية.

১৭- الإستشراق وموقفه من السنّة النبوية للأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير.

১৮- إستشراق- المصدر مشكاة الإسلامية.

১৯- أثر المملكة العربية السعودية الدائر في الإهتمام بالدراسات الإستشراقية خلال ربع قرن للدكتور مازن بن صلاح مطبقاني.

২০ - دفع شبهات المستشرقين للأستاذ أحمد محمد بوقرين.

২১ - المستشرقون والتنصير لعلى بن إبراهيم الحمد النملة.

২২ - ترجمة معانى القرآن الكريم والمستشرقون للأستاذ للدكتور محمد مهر على.

২৩ - مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم للأستاذ الدكتور محمد مهر على.

২৪ - مناهج المسشرقين في ترجمان معاني القرآن الكريم.

২৫ – الإستشراق لمازن مطبقاني.

উল্লিখিত বইগুলোর মধ্যে কিছু বই তো পাঠকের হাতের নাগালে আছে। আবার কিছু বই মাকতাবায়ে শামেলাতে পাওয়া যাবে। আর ওলামায়ে কিরামের সাথে আলোচনা করে সময় উপযোগী বইয়ের খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

বইটির ভূমিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ইংরেজি রেফারেন্স দেখা ও প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের সংক্ষিপ্ত জীবনী বের করার দায়িত্বটা ছিল আমার সহধর্মিনীর উপর। তার সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আমার কাছে সে আল-কুরআনে বর্ণিত 'হুন্না লিবাসুল লাকুম' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আল্লাহ তার খেদমত কবুল করুন এবং দুনিয়া-আখেরাতে উত্তম জাযা দান করুন।

বইটি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে আরো অনেকে অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন। লেখক, অনুবাদক ও গ্রন্থসম্পাদক সালমান মোহাম্মদ বইটির বানান সংশোধন ও ভাষা সম্পাদনার কঠিন কাজটুকু করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিত্ব, উন্নত প্রকাশনা ও জ্ঞান-গবেষণার বিশ্বস্ত বাহক মাকতাবাতুল আফনানের স্বত্বাধিকারী আবদুল হালিম নোমানি আল-আযহারিকে একটু আলাদা করে স্মরণ না করলেই নয়; তার রুচিশীল উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বইটি আজ প্রকাশের মুখ দেখতে পেয়েছে। তার উন্নত চিন্তা আর নিরলস প্রচেষ্টায় যেন 'মাকতাবাতুল আফনান' সমকালীন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আরো অসংখ্য প্রামাণ্যগ্রন্থে সমৃদ্ধ হয়— এই কামনা রইল।

আমার প্রতিটি বই প্রকাশের মুহূর্তে আমার জীবনের হাতেখড়ি যারা দিয়েছেন— আমার উসতায ও মুরুব্বিদের প্রতি মন থেকে কৃতজ্ঞতার দোয়া বেরিয়ে আসে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিশেষ সহযোগিতার ফলেই আমার এ লেখালেখির ধারা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের দুনিয়া-আখেরাতে সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করুন। সকল ধরনের অকল্যাণ থেকে হিফাজত করুন।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের শ্রম-কষ্ট কবুল করে বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তার জাযা দান করুন। আমাদের সবাইকে ওরিয়েন্টালিস্টদের ব্যাপারে করণীয় ও বর্জনীয় বুঝার এবং ইসলামের সঠিক আকিদা-বিশ্বাস অনুধাবন করার ক্ষেত্রে বইটি আল্লাহ কবুল করুন, আমিন।

দোয়াপ্রার্থী
শামসুদ্দিন ইয়াসিন
shamsuddineasin@gmail.com
১৪ শাওয়াল ১৪৩৫
১১ আগস্ট ২০১৪[৬৩]

---

৬৩. ২০১৪ সালে বইটির অনুবাদের কাজ শেষ করা হয়। বিভিন্ন কারণে ছাপানোর সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এই সুবাদে দ্বিতীয়বার বইটি সম্পাদনা করা হলো। ০৭ জুলাই ২০১৭, ১৩ যি-কাদাহ ১৪৩৮ হিজরি।

আরবি গ্রন্থের প্রকাশকের বক্তব্য

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى أله وصحبه

সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহর। দুরুদ-সালাত ও বরকত বারি বর্ষিত হোক মহামানব বিশ্বনবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আপনজন, পরিবার ও বিশ্বস্ত সহচর সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর উপর।

অত্যন্ত আফসোসের বিষয়! আজ লজ্জাবনত মস্তকে মুসলিম জাতি তাদের গৌরবময় মতাদর্শের সম্মুখে নির্জীব দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভেবে পাচ্ছে না, সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িগণের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত দীন-ইসলামকে অধুনা অন্ধকারচ্ছন্ন ইতিহাসের সম্মুখে সঠিক ও যথাযথ মর্যাদায় তারা কীভাবে সমাসীন করবে!

তারা (মুসলিমগণ) এখন যেই অবস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে তা একজন বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তি সত্তার জন্য কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়। এটা নেহায়াত পরিতাপ-পরিহাসের চূড়ান্ত বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

কেন এই অবস্থা? যেমনটি অনুমিত হয়, এর কারণ হলো আমাদের সোনালি মতাদর্শ এখন কিছু বিকৃত সাধনকারী দুষ্কর্মাদের খপ্পরে পড়ে কৌতুকে পরিণত হয়েছে। এসব লোক ইতিহাসকে কোনো আমানতাদারীতা ছাড়াই সংকলন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত ইতিহাসের বিকৃতি সাধন করে কুৎসা রটানো, কার্যকরী ইসলামি মিশন বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা ও মানবসভ্যতার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সন্দেহ তৈরি করা।

আমরা আগে যে ইতিহাস পড়েছি, তা-ই এখন আমাদের সন্তানরা শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং সকল ভার্সিটিতে তা-ই পড়ানো হয়। আমরা স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, এ হিংস্র প্রচারাভিযানের তৎপরতা ও প্রাচ্যের ইতিহাস নির্ভরতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আমাদের মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কতটুকু ক্রিয়াশীল হচ্ছে। আমাদের সন্তানরা সেই বিকৃত ইতিহাসকে বাস্তবায়ন ও তার সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য রাত জেগে নিরলসভাবে কাজ করছে।

তাদের প্রতিপালন করছে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ। শিশু বাচ্চার ন্যায় তাদের দুগ্ধপান করাচ্ছে আর জ্ঞান মস্তিষ্কে (ইসলাম বিরোধী) বিষ ঢেলে দিচ্ছে। তারা আপন নেতৃত্ব ও আনুগত্যের চাবিকাঠি তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এখন তাদের (প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের) চাহিদা অনুপাতে তারা কথা বলে। তাদের কাছে যা প্রগতি ও সভ্যতার আজ্ঞাবহ তা-ই সমাজে বাস্তবায়ন করে। এভাবেই তারা প্রকারন্তরে আপন গুপ্ত বিদ্বেষকে ছড়িয়ে দিচ্ছে মুসলিম সমাজে (যার ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত ভয়াবহ। যার কিছুটা আমরা এখন কথিত ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছি)।

এক্ষেত্রে আরব দেশে উসমানি খিলাফতের কথাই যদি ধরি, তা হলে আমরা অতি আশ্চর্যের সাথে দেখতে পাই, তাদের দৃষ্টিতে তুর্কি মুসলিমগণ ছিলেন আমাদের শোষিত অঞ্চলগুলোর জন্য দখলদার ভোগবাদী উপনিবেশ। তাদের মাঝে ইসলামি ঝান্ডাকে উড্ডীনকারী আকিদা-বিশ্বাসগত এমন কোন সম্পর্ক ছিল না; তবে যা ছিল তা যৎসামান্য। উসমানিরা তাদের লোভনীয় ঔপনিবেশিকতা ও ভোগবাদিতার যথার্থ বাস্তবায়ন করেছে।

ঐ প্রাচ্যীয় পণ্ডিত আমাদের সম্মুখে ইসলামি সভ্যতার এক অলিকচিত্র উপস্থাপন করছে, যা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের ঐ প্রয়াস একমাত্র ইসলামি সভ্যতাকে (Islamic Civiliaztion) হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, মানবসভ্যতাকে অগ্রসর ও সমৃদ্ধকারী ইসলামি সভ্যতাকে খাটো করে উপস্থাপন করার জন্য। এর ফলে একনিষ্ঠ মুসলিমদের অন্তরে হীনতা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং ইসলামকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ শুধু ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়ন ও তার বিকৃতি সাধন, কুৎসা রটানোর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তারা ইসলামি শিক্ষার সকল দিক তথা তাফসির, হাদিস ও ফিকহ (ইসলামি আইন) প্রভৃতির উপরও নগ্ন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কখনো তারা মূল (نصوص) আয়াত ও হাদিসের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে, কখনো আবার মূল আয়াত বা হাদিসের ভাষ্যের বিকৃতি সাধন করে। এটা তখনই করে যখন তাহরিফ[৬৪] তথা আয়াত-হাদিসকে পরিবর্তন করতে না পারে বা সুযোগ না পায়।

---

৬৪. تحريف হলো এক বিষয়ের আয়াত অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করা। অথবা অর্থের মৌলিক বিকৃতি সাধন করা। অনুরূপ অর্থ হাদিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আরো আফসোসের বিষয় হলো, তাদের রচিত ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ, আদব (সাহিত্য), সভ্যতা, সংস্কৃতি, জনগণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলোকে এখন বিভিন্ন ইনস্টিটিউট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে এবং এগুলো মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সকল চিন্তা-ভাবনার উৎস ও সিদ্ধান্তের চাবিকাঠি মনে করা হয় ঐসব গ্রন্থকেই।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ঐসব মনগড়া গবেষণার প্রতিবাদে ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ উপলব্ধিকারী, কুরআন-হাদিসের ধারক-বাহক বিদগ্ধ আলেমগণ তাদের অলিক জল্পনা-কল্পনার জবাব দিয়েছেন এবং অনর্থক বিতর্ক সৃষ্টিকারী বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান ও জনগণের সম্মুখে প্রকৃত অনুসন্ধানী তথ্য উদ্ঘাটন করে সেসব মনগড়া গবেষণার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন।

এই পুস্তিকাটি যদিও কলেবরে ছোট, কিন্তু ব্যাপক অর্থবহ। এটি আমার সম্মানিত পিতা শায়খ মুসতফা আস সিবায়ি রহ. এর রচিত ও সংকলিত। এই বিষয়ের প্রকৃত গুরুত্ব, ভয়াবহ প্রভাব উপলব্ধি করে তিনি এতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে চেয়েছেন।

এ কিতাবের[৬৫] বেশকিছু সূচি বা আলোচনা حضارة الاسلام (ইসলামি সভ্যতা) ও السّنة ومكانتها في التشريع الاسلامى (ইসলামি আইন ব্যবস্থায় হাদিসের অবস্থান) প্রকাশিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় পিতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পূর্বেই তাঁর মৃত্যুদূত এসে হঠাৎ কড়াঘাত করল। ফলে ইসলামি দাওয়াতের এ কাজের দায়িত্ব এখন এসে বর্তালো দীন দরদি, কর্মঠ, আত্মমর্যাদার অধিকারী আলেম সমাজের ওপর (তারাই সঠিক জবাব প্রদানে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আমি আশা রাখি)।

---

৬৫. হাস্‌সান মুসতাফা আস-সিবায়ি বলেন, ১৯৬৮ সালে কুয়েতের 'মাকতাবাতু দারিল বয়ান' 'ইসতিশরাক ওয়াল মুসতাশরিকুন' কিতাবটি আমাদের অবহিত করা ছাড়াই ছেপেছে। ছাপানোর বিষয়টি আমাদের জানার অধিকার ছিল এবং আমরা প্রকাশকদের কাছে এ প্রত্যাশা করেছিলাম। কেননা, ভাল মানসিকতার অধিকারী ও সুন্দরের প্রত্যাশী ব্যক্তির এ ধরনের সংবাদে কোন ক্ষতি সাধিত হয় না; বরং তাঁরা এ রকম উদ্যোগে আনন্দিত হয়ে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা শ্রদ্ধেয় পিতাকে প্রসারিত অনুগ্রহে ধন্য করুন। আর রহমত ও সন্তুষ্টির মেঘালয়ের বৃষ্টি তার ওপর বর্ষণ করুন। ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ হতে তাকে উত্তম জাযা প্রদান করুন।

وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

হাস্‌সান ইবনে মুসতফা আস-সিবায়ি[৬৬]
১৪১৮ হিজরি
১৯৯৮ ইসায়ি

৬৬. হাস্‌সান ইবনে মুসতাফা আস-সিবায়ি, তিনি ড. মুসতফা আস-সিবায়ি রহ.-এর পুত্র।

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের প্রতি উদার দৃষ্টি ঠিক নয়

প্রাচ্যীয় পণ্ডিত ও তাদের অধ্যয়ন এমন এক আলোচিত বিষয়, যার ব্যাপারে প্রকৃত ইসলামি গবেষকদের তেমন কেউ ব্যাপকহারে প্রাথমিক ইতিহাস, লক্ষ-উদ্দেশ্য, ভাল-মন্দ, নানা গ্রুপ, ক্রিয়া-কর্ম, (যে সকল গবেষণায় তারা সফলতা অর্জন করেছেন, আর যে সকল গবেষণায় তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এবং আপন বিষয়, আলোচনা ও সংকলনে ভ্রান্তি প্রকাশ করেছেন) প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করেননি।

তবে যারা এ বিষয়ে লিখেছেন তাদের আলোচনা প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের অনর্থক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হতে খালি নয়। যেমনঃ অধ্যাপক নাজিব আকিকির 'আল-মুসতাশরিকুন' বইটি। আর কতিপয় লেখক খুব সংক্ষিপ্তভাবে তাদের মিশনারি ও ঔপনিবেশিক তৎপরতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন।

তবে প্রাচ্যীয় পণ্ডিত ও তাদের বিকৃত গবেষণার প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানী যথার্থ মূল্যবান আলোচনা করেছেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিভাগের মহাপরিচালক ড. মুহাম্মাদ আল-বাহি রহ.[৬৭]। একদা তিনি আযহারের এক সেমিনারকক্ষে উক্ত বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন।

---

৬৭ ড. মুহাম্মাদ আল-বাহি জন্ম ৩ আগস্ট ১৯০৫, মৃত ১০ সেপ্টেমবর ১৯৮২। তিনি মিসরের আল-বুহাইরা বিভাগের ওবরা থানার আসমানিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। দশ বছরে কুরআন হিফ্জ করেন এবং এগার বছর বয়সে দুসুক নামক এলাকাতে তাজবিদের উপর দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ইস্কান্দারিয়াতে আল-আযহারের ইনিস্টিটিউটে ইন্টার সম্পন্ন করেন। তিনি ইন্টারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাস্টার্স সম্পন্ন করেন ১৯৩১ সালে। ১৯৩১ সালে জার্মানিতে দর্শনশাস্ত্রের উপর অধ্যয়ন

ড. তহা হোসাইন ও তার চিন্তাগত দাসত্ব

আমাদের মাঝে কিছু কিছু মানুষ প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল ও আস্থাবান। তাদের (ইসলামি জ্ঞানচর্চায়) শ্রমদানে তারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এরকম প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের প্রশংসাকারীদের একজন হলেন ড. তহা হোসাইন,[৬৮] যিনি প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের প্রথম সারির

করার জন্য সফর করেন। ১৯৩৬ সালে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও ইসলামি স্টাডির উপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬১ সালে আযহার ইউনিভার্সিটির পরিচালক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ড. মুহাম্মাদ বাহি রহ. এর প্রচেষ্টার ফলে আযহার ভার্সিটিতে আধুনিক জ্ঞানের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬২ সালে আযহার ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ড. বাহি আধুনিকতার পক্ষে কাজ করতেন। তবে আলি আবদুর রাজ্জাক ও তহা হোসাইনের মত অন্ধভাবে ইউরোপের অনুসরণ করাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি কালমার্কস ও লেলিনবাদের অসরতা প্রমাণ করেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র রচনা করেছেন। তার রচনাগুলোতে ইসলামের সুস্পষ্ট মতামত ও আধুনিক চিন্তাধারা ফুটে ওঠেছে। তার অন্যতম গ্রন্থ হলো–

الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم, الإسلام في الواقع الأيدولوجي المعاصر, منهج القرآن في تطوير المجتمع, تهافت الفكر المادي التاريخي, الإسلام في حياة المسلم, من مفاهيم القرآن في العقيدة والشريعة, الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي وحياتي في رحاب الأزهر, الاخاء الدين ومجمع الأديان وموقف الإسلام

আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিশ্রমকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে তার পথনির্দেশনা গ্রহণের তাওফিক দান করুন।

৬৮. তহা ইবনে হোসাইন ইবনে আলি ইবনে সালামা। তিনি জুমার দিন ১৫ নভেম্বর ১৮৮৯ সালে মিসরের আলমিনয়া বিভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। আর ২৮ অক্টোবর ১৯৭৩ সালে ৮৩ বছর বয়সে কায়রোতে মৃত্যু বরণ করেন। ড. তহা হোসাইন একজন সু-সাহিত্যিক, সমালোচক ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তাকে আরবি কবিদের গুরু বলা হত। ড. তহা হোসাইন খুবই অল্প বয়সে আরবিভাষা, গণিত, কুরআন তিলাওয়াত ও হিফ্জের পণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি এ সময় থেকে বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা সভায় উপস্থিত হতেন। বিশেষ করে তিনি আনতারা ইবনে শাদ্দাদ ও আবু যাইদ আল-হিলালীর সন্ধ্যার মজলিসে উপস্থিত হতেন। ১৯০২ সালে দীনি বিষয়গুলো শিক্ষা লাভ করার জন্য আযহারে ভর্তি হন। তার আরবি জ্ঞান আরো অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইজিপ্ট ইউনিভার্সিটিতে তিনিই প্রথম ছাত্রদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ ভার্সিটিতে তিনি আধুনিক জ্ঞান, ইসলামি সভ্যতা-

ছাত্র। সমকালীন সাহিত্যে তার অবদান স্মরণীয়। তিনি তার বই 'আল-আদাবুল জাহিলি' এর ভূমিকায় বলেন, প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের মত যাদের ইতিহাস, সাহিত্য ও নানা ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান নেই তাদেরকে কীভাবে একজন আরবিভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে গণ্য করা যায়

সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল ও ইউথোপিয়া, ইবরানি ও সিরিয়ান ভাষার উপর পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ সময়গুলোতে তিনি আযহারের বিভিন্ন ক্লাস, নানা ক্লাবের ভাষা চর্চা, ধর্মীয় আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করতেন। এভাবে তিনি ১৯১৪ পর্যন্ত জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত থাকেন। এ বছর তিনি ডক্টরেট অর্জন করেন। তবে এক পার্লামেন্ট সদস্য তার উপর ধর্মীয় রীতি-নীতি ভঙ্গের আপত্তি তোলেন। ১৯১৪ সালে তিনি সাহিত্য বিষয়ক পড়া-শুনার জন্য ফ্রান্সে পাড়ি জমান। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে স্টাডি করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মুহাম্মদ জাদুর রব, সাইয়েদ আল-মুরসিফী আল-মারাগী, মুহাম্মাদ বুখাইত, শাইখ আতা, শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু, আহমাদ যাকি ও আহমাদ কামাল পাশা। আরো অন্যান্য আরব মনীষীদের কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি ওরিয়েন্টালিস্টদের থেকেও শিক্ষার খড়ি নিয়েছেন। তাদের অন্যতম হলেন, ভূগোল বিষয়ক অধ্যাপক জুওয়াইদি, জ্যোতির্বিদ্যা অর্জন করেন কারনক নিলিনোর কাছে, সেমিটিক জাতির ভাষা শিক্ষা লাভ করেন লেটম্যানের হাতে, ইসলামি দর্শন লাভ করেন অধ্যাপক সালতানার কাছে, মধ্যপ্রাচ্য ইতিহাস-সংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন মিলোনীর কাছে, অধ্যাপক মাসিনিয়োনের কাছে দর্শনের দিক্ষা লাভ করেন এবং কালিম্যান এর কাছে ফ্রান্সের সাহিত্য চর্চা করেন। এছাড়া তিনি ফ্রান্সের অনেক অধ্যাপকের কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। ১৯১৯ সালে এসে ড. তহা হোসাইন ইজিপ্ট ভার্সিটিতে ইউনানি ও রোমানি ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫ সালে আরবিসাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেন। সাংবাদিক হিসাবেও তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'কাওকাবুশ শরক' নামের একটি পত্রিকায় তিনি তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়া 'জারিদাতুল ওয়াদি' পত্রিকাও তার অধীনে ছিল। ১৯৫০ সালে মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ড. তহা হোসাইন অসংখ্য দেশি বিদেশি ভার্সিটিতে বিভিন্ন ফেকালটিতে দায়িত্ব পালন করেন। তার রচনাবলির অন্যতম হলো, الفتنة الكبرى عثمان, الفتنة الكبرى علي وبنوه, في الشعر الجاهلي, الأيام, دعاء الكروان, شجرة البؤس, المعذبون في الأرض على هامش السيرة , حديث الأربعاء, من حديث الشعر والنثر, مستقبل الثقافة في مصر, أديب, مرآة الإسلام, الشيخان, الوعد الحق, جنة الشوك ومع أبي العلاء في سجنه وغيرها এছাড়া তার আরো অসংখ্য সাহিত্যকর্ম ও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

অথবা প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের সাথে তাকে তুলনা করা যায়? এখন তো জ্ঞান (ইলম) তাদের কাছেই অনুসন্ধান করতে হবে। আর তাদের কাছেই প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণ করা উচিত। যদি তা করি তাহলে আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাব। নিজেদের ডানা দিয়ে উড়তে পারব। আর আমরা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবো জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের অতীত যুগ, যার মাধ্যমে তারা আমাদের ওপর বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করেছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, ড. তহা হোসাইনের এ মন্তব্য চিন্তাগত দাসত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। ইতিপূর্বে আমরা আমাদের চিন্তা ও গবেষণাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য এ পথ বহুবার অতিক্রম করেছি। এসব দাসত্বমূলক ধ্যান-ধারণা ড. তহা হোসাইনের কিতাব 'আল আদাবুল জাহিলি'-তে অনেক বেশি বিদ্যমান। যদিও তার কিতাবটি নির্ভেজালভাবে ইসলাম ও আরব বিদ্বেষী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অতি কথনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য রচিত।

তার স্বরচিত বইটিতে যাদের আদর্শিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে উজ্জীবিত হয়ে লিখেছেন তাদের অন্যতম হলেন, D. S. Margoliouth. তিনি তার কিতাবে ড. এস. মার্জুলুইথ-এর মতামত একপেশে নকল করেছেন। এসব মতামতকে নিজের দিকেই সম্বোধন করেছেন। তার বইয়ে নতুন কোনো চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন নেই। আর জ্ঞানগত কোনো আলোচনার ফলাফলও নেই। তিনি নিজের মত করে বইটি লিখেছেন।

অধ্যাপক আহমদ আমিন ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা

পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারার সাথে সমন্বয়কারী আরেক আরব ব্যক্তিত্ব হলেন অধ্যাপক আহমদ আমিন।[৬৯]

---

৬৯. আহমাদ আমিন একজন চিন্তবিদ, গবেষক ও সাহিত্যিক। তিনি ১৮৮৭ কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৪ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি আযহার ইউনিভার্সিটিতে পাঠ গ্রহণ করেন এবং আইন বিষয়ক পড়ালেখা সম্পন্ন করেন। ইজিপ্ট ইউনিভার্সিটিতে আইন বিষয়ক ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি কায়রো ইউনিভার্সিটির সাহিত্য বিভাগের ডিন হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ভাষা একাডেমির সদস্য পদ লাভ করেন। তার অসংখ্য রচনাবলি, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গবেষণাপত্র রয়েছে। তার

তার নিজ বই 'ফাজরুল ইসলাম' ও 'দুহাল ইসলাম' গ্রন্থদ্বয়ে একই চিন্তার পথিক হয়েছেন। আমি السّنة ومكانتها في التشريع الاسلامى (ইসলামি আইনে হাদিসের অবস্থান)-গ্রন্থে হাদিস পরিচ্ছেদে 'ফাজরুল ইসলাম' গ্রন্থের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ঐসকল চোরাই মতামত উল্লেখ করেছি, যেগুলো আহমদ আমিন তাদের দিকে সম্বোধন না করে, নিজের ভাষা বলে চালিয়েছেন।

ড. আবদুল কাদির ও গোল্ড যিহার

পাশ্চাত্যের মতাদর্শে বিশ্বাসী ড. আলি হাসান আবদুল কাদির[৭০] এর نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي (ইসলামি আইনের ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা) গ্রন্থে একই বক্তব্য ফুটে ওঠেছে। তার উক্ত গ্রন্থটি জার্মান লেখক গোল্ড যিহারের[৭১] دراسات اسلامية এবং في العقيدة والشريعة الاسلام[৭২] গ্রন্থদ্বয়ের সমন্বয়ে রচিত। ড. তহা হোসাইন ও আহমাদ

নিবন্ধগুলো 'আর-রিসালা' ও 'আস-সিকাফা' পত্রিকায় প্রকাশ পেত। পরবর্তীতে 'ফাইদুল খাতির' ও 'যুয়ামাউল উসলাহ' নামে একত্রে ছাপা হয়।

৭০. আলি হাসান আবদুল কাদির একজন ইসলামি স্কলার। জার্মান থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। তিনি আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্‌হ বিভাগের একজন অধ্যাপক। তার আলোচনা ও লেখালেখি ওরিয়েন্টালিস্টদের মতামত দিয়ে পূর্ণ থাকত। প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। পরবর্তীতে অধ্যপনার জন্য তিনি লন্ডন চলে যান।

৭১. গোল্ড যিহার, তিনি হাঙ্গেরির ওরিয়েন্টালিস্ট। ২২ জুন ১৮৫০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যু ১৩ নভেম্বর ১৯২১। তিনি বোদাপেস্ট, বার্লিন, লিবজিগ ও লেইডেন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন দেশে অধ্যাপনার কাজ করেন। অবশেষে ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন। আমাদের এ বইয়ে বহুবার তার আলোচনা আসবে। এই প্রাচ্যবিদ অনেক প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের হাতে খড়ি দিয়েছেন। তার উপস্থাপিত ভুল তথ্য দিয়ে অতীত ও বর্তমানের প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ ইসলাম সম্পর্কে বিষোদ্গার করছেন। অবশ্য অনেক প্রাচ্যবিদ এখন আর গোল্ড যিহারের সমালোচনা গ্রহণ করেন না বলে দাবি করছেন। তাদের মতেও গোল্ড যিহার সত্যিকারের ন্যায়-নীতিবান সমালোচক ছিলেন না।

৭২. Muhammedanische Studies Halle Ges Islamic Intreduction to Theenology and law

আমিনের মত তিনিও আপন পাশ্চাত্যের উসতাদদের মতামতকে নিজের মতামত হিসেবে চালিয়ে দেন। তাদের নাম উল্লেখ করেন না।

আমি যতটুকু জানি ড. আলি হাসান আবদুল কাদির বর্তমানে ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বে আছেন। তার সাথে একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা ভাল মনে করছি। এতে রয়েছে এক বিশেষ উপদেশ। এই ঘটনার কারণেই পরবর্তীতে আমার সংকলনে সৃষ্টি হয় السّنة ومكانتها في التشريع الاسلامى

ঘটনা বর্ণনা করার আগে আমি তার অনুগ্রহ, চারিত্রিক ভাল শিষ্টাচার প্রভৃতি স্বীকার করছি, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

১৯৩৯ সালে আমরা যখন কুল্লিয়ায়ে শারইয়্যাহ-এর ফিকহ, মূলনীতি ও আইনের ইতিহাস বিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে অনার্স করছিলাম ঘটনাটি তখনকার ছিল। শাইখ আল-মারাগি রহ.[৭৩] এর যামানা; তখন ড. আলি হাসান আবদুল কাদেরকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি আমাদের ইসলামি আইনের ক্লাস নিতেন। তিনি নগদে জার্মান হতে অধ্যয়ন শেষ করেছেন। তার অধ্যাপনার বিভাগটি ইতিহাসের ধর্মতত্ত্ব অনুষদের মতই। তিনি সেখানে চার বছর ছিলেন এবং দর্শনে ডক্টরেট অর্জন করেছেন।

জার্মানে অধ্যয়নকালে ইসলাম বুঝেছেন

তিনি আমাদের প্রথম যে ক্লাসটি নিয়েছেন তার সূচনা করেছেন এভাবে— ইসলামি আইনের ইতিহাস বিশ্লেষণে আজ আমি তোমাদের লেকচার দিব, তবে একটু ভিন্ন রকম। এমন গবেষণামূলক ভঙ্গিতে যা আযহারের যুগে কোন দিন হয়নি। আমি তোমাদের কাছে স্বীকার করছি, আযহার

---

৭৩. শায়খ আল-মারাগী রহ. এর পূর্ণাঙ্গ নাম হলো, মুহাম্মাদ মুসতাফা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মুনয়িম আলা-মারাগী আল-হোমাইনী। জন্ম ১৮৮১ সালে এবং মৃত্যু ১৯৪৫ সালে। তিনি আযহার ইউভার্সিটি থেকে লেখা-পড়া সম্পন্ন করেন এবং মিসরের ইসলামি শরিয়ার কাযি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শায়খুল আযহারের দায়িত্ব প্রথম বার গ্রহণ করেন ১৯২৮ সালে। ১৯৩০ সালে তাকে অব্যহতি দেওয়া হয়। পুনরায় তিনি ১৯৩৫ সাল থেকে আমৃত্যু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চৌদ্দ বছর লেখাপড়া করেছি। অথচ ইসলাম বুঝতে সক্ষম হইনি, তবে জার্মানিতে অধ্যয়নকালে আমি ইসলামকে প্রকৃত অর্থে বুঝতে পেরেছি।

তার এ ধরনের বক্তব্যে আমি হতবাক হলাম। আমরা তখন ছাত্র। আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম তাহলে তো ভালই, যদি বিষয়টি সত্যিই হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই আমরা অধ্যাপকের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবো; হতে পারে তিনি উল্লেখযোগ্য ও মান সম্পন্ন এমন কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন, যা তিনি আমাদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করবেন, আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যা অনুপস্থিত।

তার সম্মুখে থাকা বড় একটি গ্রন্থের অনুবাদ করে হাদিসে নববির প্রসঙ্গে ক্লাসের সূচনা করলেন। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি এটি গোল্ড যিহারের রচিত গ্রন্থ।[৭৪] তিনি এই বই এর কথাগুলোই নকল করতেন। আর বলতেন, এটাই প্রকৃত গবেষণাধর্মী জ্ঞান। তার ক্লাস এভাবে চলতে থাকে। আমরা ছাত্ররা কোনো কোনো বিষয় তার সাথে বিতর্কে জড়াতাম যে, এটা সঠিক নয়। আর তিনি স্বভাবতই গোল্ড যিহারের বই-এর বর্ণিত কোনো বিষয়ের বিরোধিতা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন।

ইমাম যুহরি জাল হাদিস তৈরি করতেন

একদিন তাঁর ক্লাসের পাঠ ইমাম যুহরি রহ.[৭৫] এর হাদিস ও উমাইয়া খলিফাদের জন্য হাদিস জাল করার অপবাদ প্রসঙ্গে চলতে থাকল। আমি

---

৭৪. উক্ত গ্রন্থটি হলো, Muhammedanische Studies Haile.

৭৫. আবু বকর আল-মাদানি মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আল-হারেস ইবনে যুহর ইবনে কিলাব ইবনে লুয়াই। তার বংশধারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারার সাথে মিলিত হয়েছে। তিনি ৫৮ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। একই বছরে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওফাত হয়। ইমাম যুহরি থেকে প্রায় ২২০০ হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তিনি আনাস ইবনে মালেক ও সাহল ইবনে সাআদ রাদি. এর সংশ্রব লাভ করেন। এছাড়া সাত ফকিহের থেকেও ইসলামি জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল বলেন, ইমাম যুহরি রহ. এর সূত্রে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ আন আবিহির বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। তার থেকে আবান ইবনে সালেহ, রাবিয়া ইবনে আবি আবদুর রহমান, যায়েদ ইবনে আসলাম, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা,

ইমাম যুহরি রহ. সম্পর্কে স্বীয় তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে বিতর্কে জড়ালাম। ইমাম যুহরি রহ. ছিলেন হাদিসের ইমাম, ওলামাদের নিকট নির্ভরশীল ও নির্ভরযোগ্য। তিনি তার মতকে প্রত্যাহার করলেন না; বরং তিনি ইমাম যুহরি রহ. সম্পর্কে গোল্ড যিহারের বক্তব্যকে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করে তার থেকে নেয়ার জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন। নিজের হাতে দু'পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা আমার জন্য অনুবাদ করেন।

অন্যদিকে সাধারণ লাব্রেরিগুলোতে আমি ইমাম যুহরি রহ. এর প্রকৃত জীবনী অনুসন্ধানের জন্য যাওয়া-আসা শুরু করলাম। আমি আযহার লাইব্রেরি ও দারুল কুতুবিল মিসরিয়ার জীবনী সংক্রান্ত কোনো পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করা বাকি রাখিনি এবং তাতে ইমাম যুহরি রহ. সম্পর্কে যত বিষয় আছে সব সংকলন করেছি। এভাবে ভার্সিটির ক্লাস শেষ করে ধারাবাহিক তিন মাস গভীর রাত পর্যন্ত এই কাজে ডুবে থাকি।

আমি জ্ঞানগর্ভ, বিশুদ্ধ তথ্য-উপাত্ত একত্র করে আমাদের অধ্যাপক ড. আবদুল কাদেরকে বললাম আমার কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইমাম যুহরি রহ. এর বিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্যকে গোল্ড যিহার (Gold Ziher) পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন। তখন তিনি আমাকে বলেন, এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেননা প্রাচ্যের অধ্যাপকগণ– বিশেষ করে গোল্ড যিহার একজন নীতিবান আলেম। তিনি কোনো উদ্ধৃতি বা বাক্য পরিবর্তন করবেন না। আর কোনো বিষয় বস্তুও ওলট-পালট করবেন না। (এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস)

হিদায়া ইসলামিয়া পরিষদের সভা ও ড. আবদুল কাদিরের ভুল স্বীকার

তখন আমি হিদায়া ইসলামিয়া পরিষদের (এটি পুরাতন আবিদিন ভবনের নিকটে ছিল) মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি লেকচারের আয়োজন করার দৃঢ় সংকল্প করলাম। পরিষদ দফতর দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে এই লেকচারের

সালেহ ইবনে কিসান, আবদুল্লাহ ইবনে দিনার ও আতা ইবনে আবি রাবাহ প্রমুখ হাদিস বর্ণনা করেন। ঐতিহাসিকদের মতে বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি ১২৪ হিজরিতে ইনতেকাল করেন।

জন্য আযহারের আলেমদের ও শিক্ষার্থীদের পত্র পাঠাল। সেদিন ছাত্র-শিক্ষকদের একটি বড় অংশ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে আমাদের অধ্যাপক ড. আবদুল কাদেরও ছিলেন। এ লেকচার তার উপস্থিতিটা এবং তার মতামত প্রকাশ করাটা বিশেষভাবে কাম্য ছিল। তিনি উপস্থিত হয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ইমাম যুহরি রহ. সম্পর্কে গোল্ড যিহার যা বলেছেন তা ঘিরেই আমি বক্তব্য রেখেছি। সমাপ্তি টেনেছি এই বলে— এ বিষয়ে এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আর এটাই ইমাম যুহরি রহ. সম্পর্কে আমাদের বিদগ্ধ আলেমদের মতামত। যদি আমাদের সম্মানিত অধ্যাপক ড. আবদুল কাদির-এর এ ব্যাপারে কোন বিপরীত মন্তব্য থাকে (যদি তিনি আমার আলোচনায় পরিতৃপ্ত না হন) তাহলে আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন এ ব্যাপারে আলোচনা রাখেন। ডক্টর উঠলেন- আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন- তিনি যে আওয়াজে কথা বলেছেন তা উপস্থিত সকলে শ্রবণ করছিলেন। তিনি বলেন, আমি স্বীকার করছি, আমি এর আগে ইমাম যুহরি রহ.-কে জানতাম না। এখন আমি তাকে চিনতে পারলাম। আর তুমি যা আলোকপাত করেছ তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এর পর সভা শেষ হলো।

প্রাচ্যের অধ্যাপকদের ব্যাপারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত

তারপর আমরা অধ্যাপক সাইয়েদ খিদির হোসাইন রহ.[৭৬] এর নিকট গেলাম, যিনি পরিষদের প্রধান ও তৎকালীন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

৭৬. আস-সাইয়েদ মুহাম্মাদ আল-খিদির হোসাইন। তিনি ১৬ আগস্ট ১৮৭৬ সালে তিউনিসিয়াতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কায়রো ইনতেকাল করেন। পারিবারিক-সূত্রে তিনি জাযায়েরের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি যাইতুনিয়া থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সালে শায়খুল আযহার হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব থেকে অব্যহতি গ্রহণ করেন। শায়খ খিদির হোসাইন রহ. আমাদের জন্য মূল্যবান রচনাবলি রেখে গিয়েছেন। তার অন্যতম হলো—

رسائل الإصلاح، ديوان شعر "خواطر الحياة"، بلاغة القرآي، أديان العرب قبل الإسلام ودرسات في العربية وتاريخها، الرحلات، الحرية في الإسلام والخيال في الشعر العربي وآداب الحرب في الإسلام

প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সময় আমাদের অধ্যাপক যা বলেছিলেন তা হলো, তোমার আলোচনা প্রাচ্যের অধ্যাপকদের ব্যাপারে এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। অনুগ্রহপূর্বক তুমি আমাকে আজকের লেকচারের একটি কপি দিবে। প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ব্যাপারে গবেষণার জন্য আমি তা বিভিন্ন গবেষণাধর্মী পত্রিকাগুলোতে পাঠিয়ে দিব। আমি বিশ্বাস করি, অচিরেই প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের মাঝে এই লেকচার গর্জন-তর্জন শুরু করবে। আমি তাঁর বক্তব্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর একজন উসতাদের স্বীয় ছাত্রকে উদ্বুদ্ধকরণ থেকেও আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

কিছুদিন পর সাইয়েদ খিদির হোসাইন রহ. আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে পাঠান। আমি তাঁর সাথে একমত পোষণ করি যে, গ্রীষ্মের মৌসুমে গোল্ড যিহারের গ্রন্থটি অনুবাদ করবো এবং তার জবাব দিব; কিন্তু তারপর মিসরের কায়রোতে ইংরেজ-বাহিনীর দখলদারিত্ব নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় এবং আমাকে বন্দি করা হয়। ফলে আমি সাত বছর নিবৃত থাকি ঐ কাজ থেকে। আর এ সময়ে ড. আবদুল কাদের প্রকাশ করেন نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي বইটি। তিন বছর পর যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় তার প্রকাশিত বই-এর সংবাদ পাই।

এটাই আমার সেই ঘটনা যা আলি হাসান আবদুল কাদেরের সাথে ঘটেছিল। আমার বিশ্বাস তিনি প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ব্যাপারে তার ধ্যান-ধারণা সংশোধন করেছেন। বিশেষত গোল্ড যিহারের ব্যাপারে। তিনি সত্য পথের অনুসারী হবার দরুন আমানতদারি ও একনিষ্ঠতার সাথে আপন সিদ্ধান্তকে বদল করেছেন এবং মৌলিক বিষয় (نصوص) কে অবিকৃত রেখেছেন।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক সীমালঙ্ঘনের নামান্তর

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক সীমালঙ্ঘনের নামান্তর। এ প্রবণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বিদ্বেষ পোষণ করতে ও তার প্রচার করতে। আহমাদ ফানরেস শাদইয়াক তার গ্রন্থ যাইলুল ফারিয়া-তে বলেন, এই সকল প্রাচ্যীয় পণ্ডিত কোন শায়খের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করেন নাই। ধর্মীয় ব্যাপারে তারা অনধিকার চর্চা করছেন। এ ব্যাপারে তারা লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

কেউ যদি ধর্মীয় ব্যাপারে সামান্য কোনো জ্ঞান চর্চা করেনও, তবে তা অবশ্যই মিশনারি পাদ্রীদের কাছ থেকে করেছেন। এসব পাদ্রীগণ মাথায় কল্পিত, ভ্রান্ত চিন্তা অনুপ্রবেশ ঘটান। সেভাবে আমি কিছু জানতে পেরেছি অথচ সে কিছুই জানে না। তাদের কেউ যদি প্রাচ্যের কোন একটি ভাষায় ক্লাস করায় অথবা কিছু অনুবাদ করে, তবে তা অন্ধকারে পথ চলার মত। কোথাও যদি কোনো সন্দেহ দেখা দেয়, তা হলে তাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো জোড়াতালি দেয়া শুরু করেন। যেখানে সন্দেহ ও বিশ্বাস উভয়টা নিয়ে দোদুল্যমান থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা একটা অনুমান করেন অথবা ধারণা করেন। পরে প্রত্যাখ্যাত বিষয়কে প্রাধান্য দেয় এবং অনুত্তমকে উত্তম বানায়।

প্রকৃত কথা হলো, প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ইসলামি বিষয়গুলোর উপর গবেষণা করার ক্ষেত্রে তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা অথবা অনর্থক বিদ্বেষ পোষণ করা কোনটাই সত্যের মানদণ্ডে ঠিক নয়। আর আমরা এমন এক মুসিলিম জাতি, যাদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি পরম শত্রুর সাথেও।

আল্লাহর বাণী—

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন অন্যায় করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা ইনসাফ কর, কেননা এটাই খোদাভীতির অধিক উপযোগী ও নিকটবর্তী।

মুসতাফা আস-সিবায়ি

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ইতিহাস

সুনির্দিষ্টভাবে কেউ জানে না সর্বপ্রথম প্রাচ্যের কোন লোকটি ইসলামি বিষয়গুলো অধ্যয়ন করেছেন এবং এ-ও জানা নেই তা কখন শুরু হয়েছিল, তবে একথা তো জোর দিয়ে বলা যায়, কতিপয় পশ্চিমা ধর্মযাজক স্পেনের গৌরবময় সোনালি যুগে সেখানে আসেন। তখনকার সে-সব মাদরাসায় তারা সুশিক্ষা, সভ্যতার জ্ঞান লাভ করেন। তারা কুরআনুল কারিম ও আরবিভাষার ধর্মীয় অনেক গ্রন্থ নিজ ভাষায় অনুবাদ করেন। তারা মুসলিম বিদগ্ধ আলেমদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ শাখার অন্যতম হলো দর্শন, চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্র।

তাদের প্রথম ব্যক্তি হলেন ফ্রান্সের Jerbert, যিনি ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে রোমে অবস্থান করার জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করেন। তিনি স্পেনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীতে নিজ দেশে ফিরে যান। Pierrele Aènèrè 1092-1156 এবং Gèrard de Grèmone 1114-1187 খ্রিস্টাব্দে আসেন।

তারা নিজ দিশে ফিরে যাবার পর আরবসভ্যতার ও আরব মহাজ্ঞানী আলেমদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের প্রচার-প্রসার করতে থাকেন। তারপর তারা আরবদের মাদরাসার মতো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রস্তর করেন। বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র আর একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা আরবদের গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে পাঠদান শুরু করলেন।

তখনকার সময় ল্যাটিন ভাষায়ই ছিল ইউরোপের একমাত্র ভাষা। প্রাচ্যীয় তৎকালীন ভার্সিটিগুলো আরবদের গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে স্থায়ীত্ব পেয়ে গেল। ছয় শতাব্দি পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য আরবি গ্রন্থগুলোই উৎসমূল হিসেবে পরিগণিত হত। এ দীর্ঘ সময় এমন কোন মুহূর্ত অতিবাহিত হয়নি যখন মানুষ ইসলাম, আরবিভাষা, কুরআন অনুবাদ, কতিপয় গবেষণালব্ধ আরবিগ্রন্থ ও সাহিত্যের বই পাঠ গ্রহণ করেনি।

এভাবে চলে আসে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। এ সময় ইসলামি বিশ্বের ওপর ইউরোপ ও পাশ্চাত্যগোষ্ঠী ঔপনিবেশিকতা ও সম্পদ-সম্পত্তির ওপর আগ্রাসন সূচনা করে। তখন পাশ্চাত্যের বড় এক জামাত ইসলামি বিষয়গুলো অধ্যয়নে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে। এ লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। আরবি ও ইসলামি দেশগুলোর আরবি পাণ্ডুলিপিগুলোতে তারা পরিবর্তন সাধন করেন। তারা অজ্ঞ ও মূর্খ আরবদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে। অথবা গোলযোগপূর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সাধারণ লাইব্রেরি পাণ্ডুলিপি তারা চুরি করতো। এগুলো তারা নিজ দেশের লাইব্রেরিগুলোতে নিয়ে যেতো। যখন তারা আরবি পাণ্ডুলিপির এক বিশাল ও বিরল স্তূপ জমা করলেন তখন তা ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পাঠাতে থাকেন।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দুইশ পঞ্চাশ হাজার ভলিয়ম। এ সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর ১৯০০ শতাব্দির একেবারে শেষ ভাগে ১৮৭৩ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের সর্বপ্রথম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। আর এ রকম অসংখ্য অগণিত কনফারেন্স তারা ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আজ অব্দি করছে।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের কর্মক্ষেত্র

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের প্রথম পর্যায়ে অধ্যয়নের বিষয় ছিল আরবিভাষা ও ইসলাম। মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাদের ঔপনিবেশিকতার পরিধি বৃদ্ধি পাবার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সকল ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ভৌগলিক ম্যাপ, প্রসিদ্ধ ভাষা ও অনুকরণ-অনুসরণ প্রভৃতি বিষয় তারা স্টাডি করেছে। যদিও তাদের কাজের একটি অংশ জুড়ে আছে ইসলাম ধর্ম, সাহিত্য ও ইসলামি সংস্কৃতি। বর্তমানে প্রাচ্যবিদদের কাছে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দীনি ও রাজনৈতিক বিষয়ে দৃষ্টি রাখার জন্য তাদেরকে প্রাচ্য বিষয়ক অধ্যয়নকে উৎসাহিত করে।[৭৭]

---

৭৭. একটু পরেই এ নিয়ে আলোচনা হবে— অনুবাদক।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণার কারণ

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ইসলামি বিষয়গুলো নিয়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণ নিছক কোন কারণ ছাড়া হতে পারে না। লাভ-ক্ষতিকে সামনে রেখেই এ কাজ তারা করেছে। এর পিছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে; তবে এর পিছনে যে একাধিক কারণ রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা এর পাঁচটি উল্লেখযোগ্য কারণ উল্লেখ করলাম।

১. ধর্মীয় কারণ

প্রথম কারণটি বিশ্লেষণ করে পরিচয় তুলে ধরা এবং ব্যাপক বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা করার প্রয়োজন বোধ করি না। কেননা, পশ্চিমা অধ্যয়নকারীদের মূল টার্গেট হলো এই ধর্ম। পাদ্রী-মিশনারিদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে শুধু ইসলামের সমালোচনা করা, এর ব্যাপারে আপত্তি তোলা, সৌন্দর্যকে কুৎসিত-বিকৃতি সাধন করে বর্ণনা করা ও ইসলামি হাকিকত তথা বাস্তবতাকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা, যাতে তারা তাদের জনগণের সম্মুখে এসব ভ্রান্ত ধারণাকে প্রমাণ করতে পারে। তাহলে সর্বসাধারণ ধর্মীয় (খ্রিস্টীয়) অনুশাসন মাথা পেতে মেনে নিবে। তারা প্রমাণ করতে চায়, ইসলাম এমন এক ধর্ম, যার প্রচার-প্রসার অনুপযোগী। মুসলিমগণ উচ্ছৃঙ্খল, ডাকাত, রক্ত পিপাসু জাতি। তাদের ধর্ম তাদের কায়িক ও শারীরিক ভোগ বিলাসে উৎসাহিত করে। ইসলাম তাদেরকে চারিত্রিক গুণাবলি, জীবনযাপন ও হাসি-কৌতুক প্রভৃতি হতে দূরে রাখে। আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির গতি-ধারা দেখার পর বর্তমানে তারা আরো বেশি প্রবল বেগে হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেননা, পশ্চিমাদের কাছে মিশনারিদের আকিদা-বিশ্বাস একেবারে নড়বড়ে। এভাবে ধর্মীয় মনীষীদের কাছ থেকে সাধারণ খ্রিস্টানরা যে ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষা লাভ করেছিল তা সন্দেহ যুক্ত হয়ে গেল। অন্যদিকে প্রাচ্যের ইসলামিয়্যাত অধ্যয়নকারী গ্রুপের কাছে থাকা আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় গ্রন্থের মাধ্যমে পাশ্চাত্য মুলুকের অধিবাসীদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরানোর জন্য ইসলামি সভ্যতার উপর তারা যে কঠিন আক্রমণ করেছিল তাতে কোনো সুফল পেল না। তারা এও জানত— প্রথম দিকের ইসলামি বিজয়গুলো,

ক্রুসেডের যুদ্ধ[৭৮], উসমানি খিলাফতকালে[৭৯] ইউরোপের নানা এলাকা বিজয়ের ফলে ইউরোপ ও পাশ্চাত্য অধিবাসীদের অন্তরে ইসলামি শক্তি-সভ্যতার প্রতি ভীতি ও তার অনুসারীদের প্রতি অনীহা কাজ করছিল। কালে তারা সুযোগ সন্ধানে থাকল এবং ইসলামিয়্যাত অধ্যয়নে তারা আরো বেশি কর্মোদ্দীপনা ও তৎপরতা বৃদ্ধি করল।

এখানে তাদের রয়েছে ধর্মীয় মিশনারি টার্গেট, যা তারা স্বীয় ইসলামি স্টাডির সময় ভুলে যায় না। তারা ইসলামি সংস্কৃতি অনুসারীদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্ররোচিত করে আপন মতলব অনুযায়ী ইসলামি সুনামের উপর কুৎসা রটানোর কাজে লিপ্ত হয়, যাতে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দুর্বলতার প্রবেশ ঘটাতে পারে। উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া ইসলামি

---

৭৮. ১০৯৫ সাল থেকে ১২৯২ সাল পর্যন্ত ধর্মের নামে যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়; এ যুদ্ধের সূচনা করে ইউরোপিয়ানরা। তারা ফিলিস্তিনের জেরুজালেমকে উদ্ধারের জন্য গীর্জার পাদ্রীর সমর্থন ও আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধে নামে। তারা নির্মম ও নির্দয়ভাবে মুসলিম নর-নারী, আবাল-বনিতা, বৃদ্ধ-শিশুদের হত্যা করে। তবে খ্রিস্টানদের এ ধর্মযুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ান সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী রহ.। তিনি ১১৮৭ সালে খ্রিস্টানদের হাত থেকে জেরুজালেমসহ মুসলিম ভূমিগুলো পুনরায় উদ্ধার করেন এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের সুমচিত জবাব দিতে থাকেন।

৭৯. উসমানি খিলাফতের সূচনা হয় ১২৯৯ সনে এবং পরিসমাপ্তি ঘটে ৩ মার্চ ১৯২৪ সালে। প্রথম সুলতান ছিলেন উসমান এবং প্রথম খলিফা সেলিম। সালতানাতের প্রথম সুলতানের নামে খিলাফতের নামকরণ করা হয় উসমানি খিলাফত, যাকে ইংরাজিতে অটোম্যান খিলাফত বলা হয় মূলত উসমানকে বিকৃত করে অটোম্যান বলে। উসমানি খিলাফতের শেষ সুলতান হলেন ষষ্ঠ মাহমুদ এবং শেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ। উক্ত খিলাফতের প্রথম রাজধানী এবং সর্বশেষ রাজধানী ইসতামবুল। তুরস্ক ভিত্তিক এ শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ছিল। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী এ খিলাফত প্রসার লাভ করে। মাযহাবের ক্ষেত্রে হানাফি ও আকিদা ছিল মাতুরিদি। সমগ্র উসমানি খিলাফত বত্রিশটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ছয়শত বছর পূর্ব-পশ্চিম পৃথিবী তারা শাসন করেছেন। সুলতান ছিল সব চেয়ে প্রতাপশালী শাসক। তার মৃত্যুর পর এর পতন শুরু হয়। উসমানি খিলাফতের সর্বোচ্চ আয়তন ১৬৮৩ সালে ৫২,০০০০০ বর্গ কি.মি.। আর জনসংখ্যা ১৮৫৬ সালে ৩,৫৩,৫০,০০০ হাজার। তবে খিলাফতের পতনের কাল যত ঘনিয়ে আসছিল আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় হ্রাস পেতে থাকে। সূত্র : The Arab Lands under Ottoman Rule-208, History of the Ottoman Empir and Modern Turkay.

জ্ঞান, ইসলামি সংস্কৃতি ও ইসলামি শিক্ষা ও সাহিত্য প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সংশয় সৃষ্টিকরণই তাদের মূল টার্গেট।

২. ঔপনিবেশিক কারণ

ক্রুসেডারদের পরাজিত করার মাধ্যমে যখন ক্রুসেডযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে (এ যুদ্ধটি ধর্মীয় যুদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ঔপনিবেশিকতার যুদ্ধ) তখন তারা (ইউরোপিয়ানরা) আরবভূমি তথা ইসলামি দেশগুলোতে দখলদারিত্বের পুনরুজ্জীবিতকরণে হতাশ হয়নি; বরং এসব ভূখণ্ডের আঞ্চলিক শক্তির সাথে পরিচয় লাভ করার জন্য ইসলামি দেশের আকিদা-বিশ্বাস, স্বভাব-চরিত্র, ধন-সম্পদসহ জীবনের প্রত্যেকটি শাখায় তারা স্টাডি করার প্রতি মনোনিবেশ করে। এতে তারা ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে দুর্বল করতে পারবে। দেশকে দুর্বল করাটাই তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা মনে করল।

যখন পাশ্চাত্যবাদীদের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রভাব পূর্ণতায় পৌঁছল, তখন তারা মানবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ইসলামকে দুর্বল করার জন্য ইসলামিয়্যাত অধ্যয়নের উপর অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। তারা আমাদের চিন্তা-চেতনায় হতাশা ও হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করতে আত্মনিয়োগ করল। আর তা সফল হবে আমাদের হাতে থাকা পূর্ববর্তীদের রচিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মাঝে এবং আমাদের সঠিক আকিদা-বিশ্বাস, প্রকৃত মানবতার মাঝে সন্দেহের বেড়াজাল সৃষ্টির মাধ্যমে; তবেই আমরা আপন সভ্যতা-সংস্কৃতি হতে বঞ্চিত হব।

আমরা যদি নিজেদেরকে পাশ্চত্যের অধীনে ছেড়ে দেই এবং চরিত্র, আকিদা-বিশ্বাসের মাপকাঠি তাদের মনে করি, তা হলে পশ্চিমাদের সভ্যতা-কৃষ্টি-কালচারের কাছে এমন বিনয়ী নতজানু দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। আমাদের আর কোন মূল্য অবশিষ্ট থাকবে না।

লক্ষ্য করুন, কীভাবে তারা আমাদের দেশগুলোর মাঝে জাতীয়তাবাদকে উসকে দিচ্ছে, যা ইসলাম আগমনের ফলে আরবসমাজ থেকে মুছে গিয়েছিল। তখন আমাদের ভাষা, আকিদা-বিশ্বাস ও দেশ একটি ছিল। আরবগণ ইসলামের বাণী সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তারা

নিজেদের ও অন্যান্য জাতির মাঝে মানবিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐকান্তিকতা গড়ে তুলল। শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল। মুসলিম জাতির সম্মান-মর্যাদা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকল।

পশ্চিমারা প্রায় অর্ধ শতাব্দি ধরে চেষ্ট করছিল মিসরে ফিরাউনি, লেবানন, ফিলিসতিন ও সিরিয়াতে ফিনিশিয়ান, এমনিভাবে ইরাকে অ্যাসিরীয় সভ্যতা চালু করতে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ জাতিকে তারা বিভক্ত করে রাখতে চেয়েছিল, যাতে পশ্চিমারা স্বাধীনতার শক্তি, ভৌগলিক কর্তৃত্ব, সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণ, সভ্যতা-সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত ফিরিয়ে আনা আরব ভাইদের সাথে আকিদা-বিশ্বাসে একই বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, উন্নয়নের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, একই ইতিহাস ও একই স্বার্থ সংরক্ষণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

৩. অর্থনৈতিক কারণ

যেসব কারণে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ ইসলামিবিদ্যা ও দেশ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে, তার অন্যতম কারণ হলো অর্থনীতি। পশ্চিমারা আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে তাদের পণ্যগুলোঃ প্রচার-প্রসার করতে আগ্রহী। আর আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ কাঁচামাল (খনিজদ্রব্য) খুবই সামান্য মূল্যে কিনে নিবে, এটাও তাদের লক্ষ। কারণ তারা আমাদের আঞ্চলিক শিল্পগুলো ধ্বংস করতে চায়। বিশেষ করে যেসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান আরব ও ইসলামি দেশগুলোর বিকাশ ও উন্নয়নশীলতায় সহায়তা করে।

৪. রাজনৈতিক কারণ

রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের বিকৃত গবেষণার আরেক কারণ। আমাদের যুগের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে গ্রাস করা পশ্চিমা পণ্ডিতদের টার্গেট। প্রতিটি পশ্চিমা দূতাবাসের দূতগণ এসব দেশের সংস্কৃতি ও ভাষা (আরবি, বাংলা ও উরদু) কে আত্মস্থ করে, যাতে তারা বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ ও একান্ত আলাপ করতে সক্ষম হয়, এবং যাতে তারা বুঝতে পারে তাদের চিন্তা-চেতনা। অর্থাৎ তারা কি একনিষ্ঠ ইসলামপন্থি ও দেশপ্রেমিক, নাকি স্বার্থলোভী পশ্চিমাপন্থি, ভোগবাদি, সেকুলারপন্থি।

তাদের অনুকূলে হলে তাকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধ করে। পশ্চিমাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী তাদেরকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর উদ্বুদ্ধ করে।

অতীতে দিবালোকের মতো আমাদের নিকট এই সম্পর্কের ভয়াবহতা ফুটে ওঠেছে। ঐসব পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতগণ (যারা ইসলাম স্টাডি ও আরবিভাষা চর্চা করত) ইসলামি ও আরবরাষ্ট্রগুলোর মাঝে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য ষড়যন্ত্রের জাল ছড়াত। দীর্ঘ পর্যালোচনা আর গবেষণার পর ঐসব দেশের অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এবং নানান অর্থবহ উপদেশের মাধ্যমে তারা অন্য ইসলামি রাষ্ট্র ও আরবদেশগুলোর মাঝে বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটাত। তারা সাধারণ রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকদের মধ্যকার দুর্বলতার দিকগুলো উপলব্ধি করত; যার মাধ্যমে তাদের ঔপনিবেশিকতা ও স্বার্থ রক্ষার বিষয়গুলোর ব্যাপারে ব্যাপক জনপ্রিয়তার খবর জানতে ও বুঝতে পারত।

৫. শিক্ষাগত কারণ

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের খুব অল্প সংখ্যক গবেষকই আছেন যাদের স্টাডি নানান জাতি, তাদের ধর্মমত, সংস্কৃতি ও ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এবং খোলা মনে আলোচনার জন্য। এসব গবেষকের খুব কম সংখ্যকই ইসলামি জ্ঞান-ভাণ্ডারের অভিজ্ঞতা অর্জনে ভ্রান্তির শিকার হন; বরং তারা অতি সহজেই সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারেন। কেননা, ষড়যন্ত্র বা বিকৃতি সাধনের কোনো পরিকল্পনা তাদের (আগে থেকে) থাকে না।

ফলে ঐসব প্রাচ্যীয় মনীষীদের আলোচনা-গবেষণাগুলো সত্যাশ্রয়ী হয় এবং অন্যান্য গবেষকদের থেকে (তুলনামূলক) ত্রুটি মুক্ত হয়; বরং তাদের কেউ কেউ তো ইসলামের নির্দেশিত পথ অনুকরণ করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

নিশ্চিতভাবে একথা বলা চলে, তারা প্রচুর সম্পদ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। (তাদের নিষ্ঠা ও আমানতদারিতার কারণে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের মতবাদের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া আর সম্ভব নয়) এর কারণ হলো, তাদের আলোচনা-গবেষণাগুলো ছিল প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্ত। গতানুগতিক চিন্তা ধারার ছিল না। ধর্মীয় মিশনারি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাধারণ সমালোচক প্রমুখের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। যে কারণে তাদের

গবেষণার কোনো লাভ ও অর্জন অন্যরা দেখেনি। এ ক্ষুদ্র দলটিই মধ্যপন্থি প্রাচ্যীয় মনীষীদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণার লক্ষ ও মাধ্যম

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ইসলাম স্টাডি করার লক্ষ-উদ্দেশ্য সমষ্টিগতভাবে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—

ক. সন্দেহপূর্ণ বিকৃত গবেষণা প্রকাশ

সন্দেহপূর্ণ বিকৃত গবেষণা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তারা পাঁচটি ধাপে অগ্রসর হয়। নিম্নে তার বর্ণনা প্রদত্ত হলো।

প্রথমত : নবিজির নবুওয়াত অস্বীকার

সন্দেহপূর্ণ বিকৃত গবেষণা প্রকাশের আবার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত ও তার প্রতি নাযিলকৃত অহির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা। তাদের অধিকাংশ পণ্ডিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে অহি (প্রত্যাদেশ) প্রাপ্ত হওয়াকে অস্বীকার করে। তারা অহির প্রকাশস্থল তথা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা করে। যে-সব অবস্থা সাহাবিরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) স্বচক্ষে দেখেছেন, বিশেষত হযরত আয়েশা রা. দেখেছেন তাও তারা অস্বীকার করে। প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের মধ্য হতে যারা মৃগরোগে আক্রান্ত, তারা একের পর এক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহত করেই যাচ্ছেন।

তাদের কেউ কেউ অহিকে কাল্পনিক কথা-বার্তা সাব্যস্ত করে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্বোধন করে। আবার কেউ কেউ বলে, তাঁর রুগ্নতার কারণে তিনি এমনটি বলেছেন। তাদের কথায় যেন এটাই বুঝায়, আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বে আর কোনো নবিকে প্রেরণ করেননি। তাই তাদের কাছে অহির ব্যাখ্যা স্পষ্টকরণে কষ্টসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের কেউ কেউ ইহুদি অথবা খ্রিস্টান। তারা অবশ্যই তাওরাতের সকল নবি আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে অবহিত

এবং স্বীকার করেন। (তাদের ওপরও আল্লাহর পক্ষ হতে অহি এসেছে) আসলে তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইতিহাস, কার্যকারিতা ও তাঁর আহূত নীতিমালার ক্ষেত্রে খুবই গৌণভাবে দেখে। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতকে ধর্মীয় বিদ্বেষবশত অস্বীকার করে, যেমনটি মিশনারি, পাদ্রী ও পুরোহিতদের অন্তর হয়ে থাকে।

তারা একারণেই 'কুরআন আল্লাহর বাণী' এ কথা অস্বীকার করে। তারা অবাক হয়ে যায়, যখন একজন উম্মি নবির (যিনি দুনিয়ার কারো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি) থেকে এসব আলোচনা প্রকাশ পায়, যা পূর্ববর্তী জাতিদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। এ-তো অসম্ভব। তারা জাহিলি যুগের মুশরিকদের মত বলতে লাগল— এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাকে অন্য কেউ অবহিত করে, আর তাই তিনি আমাদের বলেন। তারা এক আশ্চর্য রকম বিকৃতি সাধন করছে। আল-কুরআনের ঐ সকল বিজ্ঞানময় চুলচেরা বিশ্লেষণ তাদের হতবাক করে দেয়, যা আর কোনো যুগে প্রকাশ ঘটেনি। একমাত্র তাঁর (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) যুগেই প্রকাশ পেয়েছিল। তারা এ বিষয়টিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রখর মেধার কারসাজি বলে চালিয়ে দেয়। এ মিথ্যা বিকৃত অপবাদের ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী মুশরিকদের থেকে আরো বেশি অগ্রগামী।

দ্বিতীয়ত : ইসলাম কোনে নতুন ধর্ম নয়

তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত ও আসমানি কুরআনকে অস্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি। এমনকি তাদের মতে ইসলাম আল্লাহর কাছে মনোনীত কোন নতুন ধর্ম নয়; বরং তাদের মতে এ ধর্ম ইহুদি-নাসারাদের ধর্ম হতে সৃষ্ট একটি নতুন ধর্ম। এ ধর্মের এমন কোনো মৌলিক সুদৃঢ় সূত্র নেই, যা নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। তা এমন কিছু রীতি-নীতির সমন্বয়ে তৈরী ধর্মমত, যা পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মাঝে ও ইসলামের মাঝে সম্মিলন ঘটিয়েছে।

পাঠক জেনে রাখুন, প্রাচ্যীয় ইহুদি পণ্ডিতদের মধ্যে গোল্ড যিহার ও জে. এফ স্কাচট[৮০] এর দাবি হলো, ইসলাম ইহুদিধর্ম ও তার প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত। আর খ্রিস্টান প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণও একই দাবি করে থাকেন (তাদের এ দাবি ভিত্তিহীন)। কেননা, খ্রিস্টান ধর্মের মাঝে এমন কোন আইন-কানুন ও জীবনব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে তারা দাবি করতে পারে ইসলাম ধর্ম তাদের মাধ্যমে প্রভাবিত ও তার থেকে কিছু গ্রহণ করেছে। (বহুবার বিকৃতির পর) বরং খ্রিস্টান ধর্মে শুধু চরিত্রগঠনের কিছু মূলনীতি রয়েছে।

তারা বিশ্বাস করে, ইসলাম এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইসলামে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাদের কথায় মনে হয় এলাহি ধর্মগুলোর চারিত্রিক মূলনীতি পরস্পর বিরোধী। (অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং এলাহি ধর্মের মৌলিক শিক্ষা একই) যেন একজন একটি ধর্ম প্রবর্তন করেছেন আর আরেকজন অন্য একটি ধর্ম প্রচলন ঘটিয়েছেন। আসলে তারা যা বলে তা থেকে মহান আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে।

তৃতীয়ত : হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা

বিদগ্ধ আলেমগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে হাদিসকে বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করেছেন তার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের অন্যতম কাজ। তারা যুক্তি হিসেবে জাল হাদিস ও দুর্বল হাদিসকে উপস্থাপন করে। অথচ তারা জানে না আমাদের শীর্ষ আলেমগণ সহিহ হাদিসকে দুর্বল হাদিস থেকে বাছাই করার জন্য সর্বাত্মক পরিশ্রম করেছেন। অনুসন্ধান আর গবেষণার ক্ষেত্রে তারা এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন যার এক দশমাংশও তাদের (খ্রিস্টান ও ইহুদি) ধর্মের কথিত বাইবেলের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা হয়নি। আমি এ সম্পর্কে চূড়ান্ত

---

৮০. J.F.Schacht তিনি ১৩ মার্চ ১৯০২ সালে পোলান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১ আগস্ট ১৯৬৯ সালে ইংলান্ডে মৃত্যু বরণ করেন। পোলান্ড থেকে পড়া-শুনা করেন এবং পরবর্তীতে সেখানেই অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। ১৯৩২ সালে তিনি সেমিটিক ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি প্রথমে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে তিনি নেদারল্যান্ডে ইসলামিক স্টাডিজের উপর অধ্যাপনা করেন।

আলোচনা করেছি সম্প্রতি প্রকাশিত আমার السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي গ্রন্থে।

তাদের এ ধোঁকা ও শঠতাপূর্ণ আলোচনার মূল কারণ হলো তারা আমাদের ধর্মীয় আলেম ব্যক্তিবর্গ যে হাদিসভাণ্ডারকে সম্বল হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাকে একটি চিন্তা প্রসূত ভাবনা আর অনর্থক আইন হিসেবে মনে করা। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। তাদের দাবি হলো, এ কথা কোনোভাবেই যুক্তি সঙ্গত নয় যে, ইসলামি সকল আইন-কানুন উম্মি নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কর্তৃক রচিত; বরং এটা প্রথম তিন শতাব্দির মুসলিমদের আমলের সমষ্টি। সুতরাং তাদের মৌলিক বিশ্বাস হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করা। আর এর থেকেই তাদের সকল বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের উৎপত্তি।

চতুর্থত : ইসলামি আইনের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা

ইসলামের যে বিশাল সমৃদ্ধ আইনি ভাণ্ডার রয়েছে তার সমপরিমাণ কোনো যুগের কোনো জাতির কাছে সংকলিত নেই। এ বিশাল আইনি পর্যালোচনার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব তাদের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, যখন তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের উপরই বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এ পন্থা অবলম্বন করল যে, এই সমৃদ্ধ আইনিকাঠামো রোমানদের থেকে ধার করা, অর্থাৎ এটা পাশ্চাত্যের জীবনধারা থেকে গ্রহণ করা একটি জীবনব্যবস্থা। আমাদের বিদগ্ধ আলেমগণ তাদের এ নোংরা দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন। তারা এটা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামি ফিকহ তথা জীবনব্যবস্থা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা জীবনব্যবস্থা, যা কারো থেকে ধার করা নয়। আলেমদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বিদ্বেষীদের নির্বাক ও লা-জাওয়াব করেছে। আর সত্যানুসন্ধানি ব্যক্তিদের পরিতুষ্ট করেছে।

পঞ্চমত : আরবিভাষার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা

তারা আরবিভাষার ভাষা শৈলী ও পরিপক্কতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তাদের মতে আমাদের উপর তাদের সাহিত্যের কর্তৃত্ব ও অনুগ্রহের ছায়া

প্রদান করছে। তারা আরবি সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে জোরালো সন্দেহ পোষণ করে। তারা আরবি সাহিত্যের অনুর্বরতা ও নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে, যাতে আমরা তাদের কথিত (পশ্চিমা) সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হই এবং তা গ্রহণ করি। আর এটা হলো সৈন্যবাহিনী দিয়ে ঔপনিবেশকতার মত সাহিত্যের ঔপনিবেশিকতা। উপরেল্লিখিত এসব কদর্যপূর্ণ ভ্রান্ত গবেষণাকে লক্ষ করেই তারা ইসলাম স্টাডি করে থাকে। তাদের অধিকাংশের চিন্তা-চেতনা এমনই।[৮১]

খ. ধর্মীয় ও রাজনৈতিক লক্ষ-উদ্দেশ্য

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক লক্ষ উদ্দেশ্যের সারাংশ নিম্নরূপ—

এক. মৌলিক বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করা

মুসলিমদের নবি (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন-হাদিস, আইন-জীবনব্যবস্থা, ফিক্‌হ তথা মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা। এতে তাদের দুটি লক্ষ অর্জিত হয়। ১. ধর্মীয় ২. ঔপনিবেশিক।

দুই. মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা এবং সন্দেহের বেড়াজাল সৃষ্টি করা

তারা দাবি করে, এই ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি রোমানদের হতে গৃহীত। আরব এবং মুসলিমগণ তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির আদলেই প্রতিষ্ঠিত। তাতে কোন নব্য আবিষ্কারক চিন্তা-ভাবনা এবং প্রেরণাদায়ক কোন সভ্যতা নেই; বরং তাদের সভ্যতার সর্বত্র রয়েছে ত্রুটি-বিচ্যুতি। যদিও তারা ইসলামি সভ্যতার কোন একটি দিকের প্রশংসা করে (যদিও তা কম); তথাপি অসংখ্য অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি সাথে সাথে উল্লেখ করে। (ফলে পূর্বের প্রশংসনীয় দিকটি হালকা হয় ও গ্রহণযোগ্যতা হারায়)।

---

৮১ তবে কিছু মনীষী সত্যের অনুসন্ধানী ছিলেন। অবশ্যই তারা সে পথ গ্রহণ করেছেন। বইয়ের ভূমিকাতে তাদের আলোচনা করা হয়েছে— অনুবাদক।

তিন. মুসলিমদের গবেষণালব্ধ রচনার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ মৌলিকত্ব, আকিদা-বিশ্বাস প্রভৃতির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে থাকেন, যাতে ঔপনিবেশিকতার ভীত মজবুত হয় এবং মুসলিমদের মাঝে তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মুসলিমরা তাদের সভ্যতার দাসে পরিণত হবে। তাদের সভ্যতাই মুসলিমদেরকে প্রাচ্যীয় ভাবধারার প্রতি টেনে নিয়ে যাবে। আর তাদের মাঝে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতিবাদী শক্তি থাকবে না।

চার. ইসলাম-পূর্ব জাতীয়তাবাদ ও গোত্রীয় বিদ্বেষ পুনর্জ্জীবিত করা

ইসলাম-পূর্ব জাতীয়তাবাদ ও গোত্রীয় বিদ্বেষ পুনর্জ্জীবিত করে পৃথিবীর মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোতে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ দুর্বল করা, মুসলিমদের মাঝে মতনৈক্যের বীজ বপন করা ও আঞ্চলিকতাকে উসকে দেয়া প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের অন্যতম কাজ। আর অনুরূপ কু-কর্ম তারা আরবদেশগুলোতে চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে কোনো বিষয়ে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। এক্ষেত্রে তারা তাবেদারী সর্বশক্তি ব্যয় করছে। একতা ও ঐক্যবদ্ধতা হতে নিবৃত রাখার জন্য ইতিহাসকে নতুন রূপে বিকৃত সাধন করছে। ব্যক্তি জীবনের ঘটনাকে পুঁজি করে নতুন ইতিহাস রচনার চিন্তা করছে, যাতে আরবদের এক ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখা যায় এবং জনগণের মাঝে সত্য ও কল্যাণকর বিষয় বুঝার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করা যায়।

গ. পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক একনিষ্ঠ গবেষণা

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক একনিষ্ঠ গবেষণা কোনো কোনো প্রাচ্যীয় মনীষীদের কতিপয় ইসলামি গবেষণায় ওঠে এসেছে; তবে এর সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। গবেষণা ও পর্যালোচনায় তাদের সততা থাকলেও তারা ভুল-ভ্রান্তি আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে নিরাপদ ছিলেন না। এর বহুবিদ কারণ থাকতে পারে। যেমন—

১. আরবিভাষার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা,

২. প্রকৃত ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা,

৩. তারা ইসলামি সমাজব্যবস্থাকে তাদের কল্পনা প্রসূত বিকৃত সমাজব্যবস্থার মত ভাবতে ভালবাসে। তারা ভুলে গেছে উভয় ব্যবস্থার মাঝে প্রাকৃতিক, আত্মিক ও সমকালীন এমন কিছু ব্যবধান রয়েছে, যা তাদের অধ্যাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস এবং তাদের বাস্তব জীবনের ইতিহাস-ভিন্নতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

তবে অন্য তিন গ্রুপ থেকে এই দলটি একটু নিরাপদ ও ক্ষতির সম্ভাবনায় ক্ষীণ। সত্য বিষয়টি তাদের কাছে প্রকাশিত হলে তা তারা গ্রহণ করেন। তাদের মাঝে কেউ কেউ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে অধ্যয়ন করেন। সত্যকে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে ফলাফল প্রকাশ করেন; কিন্তু তারপরও তারা পূর্ববর্তী দুই গ্রুপের রোষানলে পতিত হন। কারণ, অন্য প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ তাদের সমালোচনা করে বিভিন্নভাবে। বলা হয়, তারা গবেষণার নীতি হতে বিচ্যুত হয়েছেন অথবা স্বীয় গবেষণা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত করেছেন কিংবা মুসলিমদের সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী ও তাদের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এ ধরনের মতামত দিয়েছেন।

যেমন, তারা সমালোচনার পাত্র বানিয়েছেন টমাস আরনোল্ডকে। তিনি তাঁর রচিত (الدعوة الي الإسلام) 'ইসলামের আহ্বান'[৮২] গ্রন্থে মুসলিমদের পক্ষে ন্যায়ভিত্তিক আলোচনা করেছিলেন। এই বইটিতে প্রত্যেক যুগে মুসলিমগণ অমুসলিমদের সাথে যে উদার আচরণ করেছেন এবং বিপরীতে অমুসলিমগণ মুসলিমদের সাথে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন তার বিবরণ তুলে ধরেছেন। এগুলো তিনি রেফারেন্সসহ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। ইসলামি উদারতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত এই বইটি। এ কারণে বিদ্বেষী প্রাচ্যীয় পণ্ডিত, ধর্ম প্রচারক ও মিশনারিগণ তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, এ গ্রন্থকার মুসলিমদের প্রতি আসক্ত ও অতি উৎসাহী হয়ে এমনটি লিখেছেন। অথচ লেখক প্রতিটি ঘটনা ও আলোচনার বর্ণনা উৎস-গ্রন্থের টীকাসহ উল্লেখ করেছেন। এরকম আরেক জন মধ্যপন্থি পাশ্চাত্যগবেষক ছিলেন ফ্রান্সের শিল্পী ড্যানিয়া, যিনি আলজেরিয়ায় বসবাস করতেন। তিনি ইসলামের পরশে

৮২.বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে— সম্পাদক।

অভিভূত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করে 'নাসিরুদ্দিন ড্যানিয়া' নাম ধারণ করেন। তিনি আলজেরিয়ার এক আলেমের সঙ্গে যৌথভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলাম সম্পর্কিত তার একক গ্রন্থের নাম (أشعة خاصة بنور الإسلام) 'ইসলামের আলোতে আলোকিত'। তিনি এতে ইসলাম ও রাসুলের ওপর তার জাতীর (খ্রিস্টানদের) অত্যাচার ও নিপিড়নের লোমহর্ষক বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি ফ্রান্সে ইনতেকাল করেন। তার কফিন আলজেরিয়াতে আনা হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়।

টার্গেট বাস্তবায়নে যে মাধ্যমগুলো ব্যবহারিত হয়

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ তাদের মতাদর্শ আর বিকৃত মতামত প্রচার করার জন্য সকল উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। নিম্নে তাদের এসব মাধ্যমের বিবরণ প্রদত্ত হলো।

১. বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ

কুরআন, রাসুল ও ইসলামে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে তারা গ্রন্থ/বই রচনা করেন। অধিকাংশ বই-ই কুরআন-হাদিসের সরাসরি বিকৃত সাধন করার জন্য লিপিবদ্ধ এবং ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ম্লান করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

২. পত্র-পত্রিকা প্রকাশ

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ ইসলাম, ইসলামি দেশ ও জাতি প্রভৃতি নিয়ে বিশেষ আঙ্গিকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। বিষয়ভিক্তিক গ্রন্থ ও পত্রিকার আলোচনা সামনে আসবে।

৩. মিশনারি প্রেরণ

ইসলামি বিশ্বের আনাচে-কানাচে মানবিক তৎপরতার নামে ধর্মীয় মিশনারি প্রেরণ করে। তারা হাসপাতাল, ভার্সিটি, বিদ্যালয়, শিশুসদন, বৃদ্ধাশ্রম ও অথিতিশালা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন: আরব দেশে জমইয়্যাতুশ শুব্বান আল-মাসিহিয়্যাহ-সহ আরো অনেক সংগঠন রয়েছে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক সেমিনার

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা একাডেমিগুলোতে তারা বিতর্কের আয়োজন করে। যেসব বিতর্ক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও বীতশ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি করে। কায়রো, দামেশক, বাগদাদ, রাবত (মরক্কো), করাচি, লাহোর, আলিগড় প্রভৃতি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তারা ইসলামি বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্কের আয়োজন করে।

৫. নামি-দামি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রেরণ

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ তাদের স্থানীয় পত্রিকা-ম্যাগাজিনগুলোতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে। আমাদের দেশে (মিসরে-সিরিয়াতে) এসব ম্যাগাজিন স্বল্প মূল্যে সংগ্রহ করা যায়। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন ড. উমর ফররুখ[৮৩] ও মুসতফা আল-খালিদি[৮৪]। তাদের রচিত মিশনারি ও

---

৮৩. উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ফর্‌রুখ রহ.। তিনি ১৯০৬ সালে লেবাননের রাজধানী বাইরুতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি লেবাননে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা শেষে জার্মানি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আরবির পাশাপাশি ফরাসি, জার্মানি ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করেন। তিনি পশ্চিমাদের ভার্সিটিগুলোতে অধ্যয়ন করলেও তাদের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। উপযুক্ত স্থানে তাদের অপপ্রচার ও অপকর্মের জবাব দিতেন। তার রচনাবলির মধ্যে অন্যতম হলো,

الأسرة والتشريع الإسلامي و تجديد في المسلمين لا في الإسلام وغيرهما

৮৪. ড. মুসতফা খালিদি ১৮৯৫ সালে লেবাননের রাজধানী বাইরুতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মূলত সিরিয়ার অধিবাসী। খালিদী বংশগতভাবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদি. এর সাথে সম্পৃক্ত। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আরবিভাষা ও কুরআনে কারিমের শিক্ষা গ্রহণ করেন। Church of Scotland বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। পরে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে মেডিক্যাল বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। এ সময় তিনি উসমানি খিলাফতের সৈন্য ইউনিটে ভর্তি হন এবং সেখানেই মেডিক্যালের পড়ালেখা শেষ করেন। তিনি বাইরুতে গাইনী চিকিৎসক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ বিষয়ের উপর তিনি চূড়ান্ত গবেষণা করেন। তার অসংখ্য রচনাবলি রয়েছে। অন্যতম হলো, Muslim Lebanon Today ১৯৫৩ সালে বইটি প্রকাশ করার কারণে তৎকালীন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাকে বিচারের মুখামুখী করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

ঔপনিবেশিকতা (التبشيروالإستعمار في العرب) গ্রন্থে[৮৫]। সে গ্রন্থে প্রাচ্যীয় ইসলামগবেষক ও মিশনারিদের ঔপনিবেশিক সেবার একটি খণ্ডচিত্র এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে— মিশনারি বা প্রাচ্যীয় ধর্ম-প্রচারকগণ এই মর্মে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তারা অন্যান্য ইসলামি দেশের তুলনায় ব্যাপকভাবে মিসরীয় সংবাদ মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকা থেকে খ্রিস্টধর্ম প্রচার-প্রসারের জন্য অধিক সুবিধা ভোগ করছেন। আর এ রকম অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ মিসরীয় পত্রিকাগুলোতে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ-নিবন্ধ অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়; তবে কখনো বিনামূল্যেও তাদের লেখা প্রকাশ করা হয়।

৬. কনফারেন্সের আয়োজন

ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের বিকৃতি ও ধ্বংস সাধনের লক্ষ্যে তাদের কর্মপরিকল্পনার জন্য বিশেষ কনফারেন্স ও সেমিনারের আয়োজন করে। সর্বপ্রথম এ জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয় ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এখনো এসব অব্যাহত আছে।

৭. তথাকথিত বিশ্বকোষ

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ دائرة المعارف الإسلامية নামে ইসলামি বিশ্বকোষের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। এটি সফলভাবে অসংখ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে তার নতুন এডিশন প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। আমি (ড. মুসতফা আস-সিবায়ি) যখন ১৯৫৬ সালে অক্সফোর্ড গমন করি তখন বিশ্বকোষের সেক্রেটারির মাধ্যমে এর প্রথম অংশের দ্বিতীয় এডিশন সম্পর্কে অবগত হই। এখন এটির আরবি সংস্করণের কাজ শুরু হয়েছে। এমনকি এ পর্যন্ত তেরোটি ভলিয়ম প্রকাশও পেয়েছে। এ বিশ্বকোষে যারা কাজ করছেন তারা ছিলেন প্রাচ্যীয় নামকরা পণ্ডিত। তারা ছিলেন চরম ইসলাম বিদ্বেষী।

---

৮৫. এই গ্রন্থটি একজন আধুনিকমনা মুসলিমের অবশ্যই পাঠ করা উচিত। পাঠক চাহিদার কারণে বাইরুতে দু'বার বইটি প্রকাশিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্র সিরিয়াতে পশ্চিমাদের কিছু এজেন্টের কারণে বইটি প্রকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়।

তাদের এ কর্মটি ঘিয়ের মাঝে বিষ দিয়ে ষড়যন্ত্রের নামান্তর। ইসলাম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে ভ্রান্ত মতবাদ দিয়ে পূর্ণ করা; তবে দুঃখের বিষয় হলো আমাদের রক্ষণশীল অনেক গবেষক বক্তব্য উপস্থাপনের সময় তথাকথিত বিশ্বকোষ দিয়ে উদ্ধৃতি দিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। ঐ বিশ্বকোষ দিয়ে উদ্ধৃতি দিতে না পারলে তাদের কাছে আপন গবেষণা অসম্পূর্ণ মনে হয়। এটা ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রকাশ্য অজ্ঞতা বলা চলে।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ-পত্রিকা পরিচিতি

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের লক্ষ-উদ্দেশ্য, তাদের শ্রেণিবিন্যাস, তাদের উপায়-উপকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো। আমরা পাঠকের অবগতির জন্য প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত বিশেষ কিছু পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিনের বর্ণনা এখানে উল্লেখ করবো। এগুলো তাদের ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে প্রকাশ পায়।[৮৬]

প্রকাশিত ম্যাগাজিন

ক. ফ্রান্সের অধিবাসী প্রাচ্যপণ্ডিতগণ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে একটি গবেষণা পরিষদ গঠন করেন। ১৮২০ সালে এর আরেকটি সভার আয়োজন করেন এবং তখন থেকে তারা (المجلة الآسيوية) 'এশীয় ম্যাগাজিন' প্রকাশ করেন।

খ. ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রাচ্যীয় শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করনের জন্য একটি সংস্থা চালু করা হয়। তৎকালীন রাজার পক্ষ হতে এটা তত্ত্বাবধায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা হতো। এই সংস্থা থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ পেত, যার নাম (مجلة الجمعية الآسيوية الملكية) 'এশীয় রাষ্ট্রের গবেষণা ক্রোড়পত্র'।

গ. ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান অধিবাসীগণ একটি সংস্থা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন (الجمعية الشرقية الأمريكية) 'প্রাচ্যীয় আমেরিকান

৮৬.প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের নামের সংকলন, প্রসিদ্ধ পত্রিকা-ম্যাগাজিন ও গ্রন্থ প্রভৃতির আলোচনা ড. মুহাম্মাদ আল বাহায়ী-এর প্রদত্ত লেকচার المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সংস্থা' নামে। একই বছর জার্মানীর পণ্ডিত তাদের জন্য এক বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। অনুরূপ অস্ট্রিয়ান, ইতালিয়ান ও রাশিয়ান নামধারী ইসলাম গবেষকরা আলাদা আলাদা (ইসলাম বিরোধী) ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন।

ঘ. বর্তমান শতাব্দিতে আমেরিকান ইসলামি- পণ্ডিতগণ যেসব পত্রিকা প্রকাশ করেন তার অন্যতম হলো (مجلة جمعية الدراسة الشرقية) 'মধ্যপ্রাচ্য শিক্ষা পরিষদ সাময়িকী'। এটি Ohio এর Gambier শহর থেকে প্রকাশিত হয়। এর শাখা রয়েছে লন্ডন, প্যারিস, লাইপেজিড ও কানাডার টরেন্টো শহরে। সচরাচার এটা প্রকাশিত হয় না। এটি প্রতি বছর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ নিয়ে প্রকাশ করা হয়। কখনো কখনো জটিল দীনি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়। যেমন: এটির একটি বিশেষ অধ্যায় আছে— 'গ্রন্থাবলি'।

ঙ. সম্প্রতি আমেরিকান ইসলামি পণ্ডিত আপন তত্ত্বাবধানে (مجلة شؤون الشرق الأوسط) 'মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সাময়িকী' অনুরূপ (مجلة الشرق الأوسط) 'মধ্যপ্রাচ্য সাময়িকী' প্রকাশ করছেন। এগুলোতে সাধারণত প্রাচ্যীয় রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ বেশি প্রাধান্য পায়।

চ. সম্প্রতি মারাত্মক ক্ষতিকর যে পত্রিকা/ম্যাগাজিনটি আমেরিকান ইসলাম বিষয়ক গবেষক ও পণ্ডিতগণ প্রকাশ করেন তা হলো (العالم الإسلامي) বা The Muslim World ম্যাগাজিন। এটি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কট্টর Zweimer প্রকাশ করেন। এখন তা আমেরিকার হার্টফোর্ট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক হলেন কে. ক্র্যাগ[৮৭]। পত্রিকাটি মিশনারিদের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করে।

---

৮৭. Albert Kenneth Cragg- তিনি ৮ মার্চ ১৯১৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩ নভেম্বর ২০১২ সালে ৯৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ক্রাগ ছিলেন অ্যাংলিকান বিশপ ও পণ্ডিত। তিনি ব্ল্যাকপুল গ্রামার স্কুল ও অক্সফোর্ডের জেসাস কলেজ থেকে অধ্যয়ন করেন। তিনি ক্যান্টারবেরীর সেইন্ট অগাস্টাইন কলেজের আরবি ও ইসলামিক শিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। আলবারট ক্রাগ মিসরের এংলিকান চার্চেও বিশপের দায়িত্ব পালন করেন। তার রচিত বই- The Call of Minaret (১৯৫৬), Sandals at the Mosque: Christian Presence Amid Islam (১৯৫৯), The Event of the Qur'an-Islam in its Scripture(১৯৭১).

ছ. The Muslim World পত্রিকার সমপর্যায়ে ফ্রান্সের ইসলাম বিষয়ক গবেষকগণ বিদ্বেষপূর্ণ মিশনারি পত্রিকা বের করেন, যার নাম হলো The Monde Muslim .

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ ও তাদের বিভ্রান্তিকর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমকালীন শীর্ষ প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ ইসলাম, ইসলামি রাষ্ট্র ও আরবদেশগুলো নিয়ে তাদের গবেষণা লব্ধ প্রকাশিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো—

এ. জে. আরবেরি A. J. Arberry

এ. জে. আরবেরি[৮৮] ইংল্যান্ডের অধিবাসী। ইসলাম-মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি। তিনি Encyclopaedia of Islam বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক। বর্তমানে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন; তবে দুঃখের বিষয় হলো, ইংল্যান্ডে যারা ইসলামিক স্ট্যাডিজ ও ভাষা বিষয়ে পড়ালেখা করেছেন তাদের অধিকাংশের অধ্যাপক তিনি।

ইসলাম বিষয়ক তার রচনাবলি

১. الإسلام اليوم 'ইসলামি দিনকাল' ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২. مقدمة لتاريخ التصوف 'আধ্যাত্মিকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট'। বইটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৩. التصوف 'তাসাউফ' এটি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৪. ترجمة القرآن 'কুরআনের অনুবাদ'। এটি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৮৮.এ. জে. আরবেরি-আর্থার জন আরবেরি (Arthur John Arberry)- ১২ মে ১৯০৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২ অক্টবর ১৯৬৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি পোর্টস সাউথ গম্মামার স্কুল ও ক্যামব্রিজে পড়াশুনা করেন। আরবেরি ব্রিটিশ ওয়ারিয়েন্টালিস্ট। তার রচনাবলির মধ্যে অন্যতম হলো, Sufism an accout of the mysticl of Islam (১৯৫০) and Reveiation and Rcason in Islam ete.

এ. জিওম A. Geom

এ. জিওম[৮৯] ইংল্যান্ড অধিবাসী সমকালীন প্রাচ্যবিদ। ইসলাম ধর্মের প্রতি বিষোদ্গারের ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকান ভার্সিটিগুলোতে লেকচার দিয়ে থাকেন। লেখালেখি ও মিশনারি কর্মকাণ্ডে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছেন। তার অন্যতম বই الإسلام - তবে পরিতাপ ও পরিহাসের বিষয় হলো, মিসরে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাদেরকে বিদেশে প্রাচ্যের ভাষা অধ্যাপনার জন্য প্রেরণ করা হয় তাদের অধিকাংশ তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন।

ব্যারন কারা ডি ভাক্স Baron Carra De Vaux

ব্যারন কারা ডি ভাক্স[৯০] ফ্রান্সের অধিবাসী। ইসলাম ও মুসলিমের কঠোর সমালোচক। ইসলামি বিশ্বকোষ রচনায় তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।

এইচ. এ. আর. গিব H.A.R. Gribb

এইচ. এ. আর. গিব[৯১] সমকালীন ইংল্যান্ডের শীর্ষ এক ইসলামী গবেষক, যিনি মিসরের ভাষা একাডেমির অন্যতম সদস্য। বর্তমানে তিনি

---

৮৯. এ. জিওম (A. Geom)- তিনি ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩০ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে মৃত্যু বরণ করেন। জিওম পেশায় ভার্সিটির অধ্যাপক ও চার্চের গুরু ছিলেন। ইংরেজি, হিব্রু ও আরবি ভাষা সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন। তার অন্যতম রচনাবলি—

١) تراث الإسلام, ١٩٢٤ ٢) أثر اليهودية في الإسلام, ١٩٢٧ ٣) اليهود والعرب, ١٩٤٦ ٤) مدخل إلى علم الحديث, ٥) الإسلام, ١٩٥٤

৯০. ব্যারন কারা ডি ভক্স (Baron Carra de Vaux)-তিনি ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৩ সালে মারা যান। তার রচিত অন্যতম গ্রন্থ La Doctrine de l Islam (১৮৬৭), Avicenne-১৯০০, Gazali-১৯০২, Les Penseurs-১৯২১-১৯২৬ etc। এছাড়া তিনি ফ্রান্স ভাষায় 'মুহাম্মাদী আইন' নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৯১. এইচ. এ. আর. গিব- Hamilton Alrxander Rosskeen Gibb। তিনি একজন ইতিহাসবিদ। ২ জানুয়ারি ১৮৯৫ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২২ অক্টোবর ১৯৭১ সালে ৭৬ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। গিব এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে সেমিটিক(হিব্রু, আরবি ও আরাম) ভাষার উপর অনার্স করেন। পরবর্তীতে ১৯২২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিভাষার উপর এম এ করেন।

আমেরিকার হার্টফোর্ড (Hartford) বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিয়্যাত বিভাগের অধ্যাপক। Encyclopaedia of Islam নামক গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ও প্রকাশক। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। এতে যেমন গভীরতা রয়েছে তেমন মারাত্মক আপত্তিও রয়েছে। তার বিশেষ কিছু রচনাবলি হলো—

১. طريق الإسلام -একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে এটি রচনা করা হয়। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হলেও পরে তা একই নামে আরবি ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

২. الاتجاهات الحديثة في الإسلام 'ইসলাম ধর্মের আধুনিকতার দিকদর্শন'। এটি ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। বারংবার এটি মুদ্রিত হয়। পরে বইটি উল্লিখিত নামে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

৩. المتهب المحمدي 'মুহাম্মাদী আদর্শ', বইটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে একাধিকবার মুদ্রিত হয়।

৪. الإسلام المجمع الغربي 'ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থা'। এটি কয়েক ভাগে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে আরো অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তার বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে।

হাঙ্গেরির অধিবাসী Gold Ziher

গোল্ড যিহার[৯২] যিনি হাঙ্গেরির অধিবাসী। তিনি একজন খ্যাতিমান ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামিয়্যাত গবেষক। তার ধ্বংসাত্মক বেশ কিছু রচনা রয়েছে। তিনি Encyclopaedia of Islam এর অন্যতম গ্রন্থাকার। তিনি কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার অন্যতম বই متاهب تفسير

তিনি স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ এ শিক্ষাকতা করেন। এয়াড়া গিব ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলামের অন্যতম সম্পাদক। তার রচনাবলির মাঝে অন্যতম হলো, Mohammedanism, Studis on the civilization of Islam and The Life of Islam etc.

৯২. গোল্ড যিহারের আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

الإسلامي আরবি ভাষায় এ নামেই এটি প্রকাশ করা হয়েছে। গোল্ড যিহারকে নিয়ে একটি ঘটনা এই বইয়ের দ্দরুতে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ আলোচনা থেকেই তার ইসলাম বিদ্বেষী কার্যক্রম অনুধাবন করা যায়।

জন মায়নার্ড Jon Maynard

জন মায়নার্ড[৯৩] পক্ষপাতে দুষ্ট এক আমেরিকান পণ্ডিত। তিনি مجلة جمعية الدراسات الشرقية 'মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা পর্ষদ' পত্রিকার একজন নিয়মিত প্রবন্ধকার। বিশেষত তিনি মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলাম সংক্রান্ত নতুন গ্রন্থাদি নিয়ে পত্রিকায় আলোকপাত করেন। উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে এ পত্রিকার ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠায়।

এস. এম. জুইমার M. Zweimer

এস. এম. জুইমার,[৯৪] তিনি একজন ইসলামিয়্যাত গবেষক ও মিশনারি। ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে বেশ জশ-খ্যাতি রয়েছে। আমেরিকান মিশনারি পত্রিকা العالم الإسلامى এর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তিনি تحد العقيدة الإسلام রচনা করেন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দুস্তানের লাখনুতে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মিশনারি দ্বিতীয় কনফারেন্সের সকল প্রবন্ধ الإسلام নামে প্রকাশ করেছেন। তার মিশনারি কর্মতৎপরতার স্মৃতি হিসাবে আমেরিকানরা তার নামে ধর্মতত্ত্ব ও মিশনারি প্রতিষ্ঠান ওয়াকফ করেছে।

---

৯৩. জন মায়নার্ড, তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৯৪. এস. এম. জুইমার- Samuel- Marinus Zwemer ১২এপ্রিল ১৮৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২ এপ্রিল ১৯৫২ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে তার মৃত্যু হয়। তিনি ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আরবরাষ্ট্রে মিশনারির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৩-১৯২৯ সাল পর্যন্ত মিসরে কাজ করেন। জুইমার ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। তিনি বহু খ্রিস্টানকে মিশনারি কাজে উৎসাহিত করেন। এ বিষয়ে তিনি প্রচুর লেখালেখিও করেন। তার রচিত অন্যতম বই- The Moslem Doctrine of God, Influence of Animism in Islam, The laws of Apostasy in Islam etc.

আযিয আতিয়া সুরইয়াল

আযিয আতিয়া সুরইয়াল[৯৫] (عزيز عطية سوريال) তিনি মিসরীয় খ্রিস্টান। সুরইয়াল ইসকান্দারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার আঞ্চলিক ভার্সিটিগুলোতে ক্লাস নেন। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণকারী ও ইসলামি শিক্ষা-আদর্শের অন্যতম বিকৃত সাধনকারী। তার ধর্মযুদ্ধ সংক্রান্ত বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে।

জি. ভন. গ্রানবাউম G. Von Grunbaum

জি. ভন. গ্রানবাউম[৯৬] জার্মান বংশদ্ভূত ইহুদি। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেকচারার। এক সময় শিকাগো ভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। ইসলামের অন্যতম শত্রু। তার সব রচনাবলিতেই বিকৃত এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে সীমা অতিরিক্ত বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ তাকে নিয়ে বেশ গর্ব করেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো—

---

৯৫. আযিয আতিয়া সুরইয়াল- Aziz Atia Suryal. তিনি মিসরে ৫ জুলাই ১৮৯৮ সালে জেফতা নামক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে ৯০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। সুরইয়াল এক সাথে অনেক ভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগের ইতিহাসের অধ্যাপক, আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিভাগের ডাইস-ডিন ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি শিক্ষার পরিবদর্শন অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তার অন্যতম রচনাবলি- The Coptic Encyclopedia

৯৬. জি. ভন. গ্রানবাউম- Gustave Edmund Von Grunebaum. তিনি ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সালে ভিয়েনার অষ্ট্রিয়াতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে ক্লাসিকাল আরবি কবিতার উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবির অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৭ সালে লস এঞ্জেলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ার স্টার্ন হিস্টোরি নামে নতুন একটি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার সংকলিত গ্রন্থাবলি- Classical Islam (1970), Modern Islam: The Search for Cultural Identity (1962), Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation (1946), Muhammadan Festivals (1951).

১. الإسلام العصور الوسطي 'মধ্যযুগীয় ইসলাম'। ১৯৪৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

২. الأعياد المحمدية 'মুহাম্মাদী উৎসব'। এটি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৩. محاولات في شرح الإسلام المعاصر 'সমকালীন ইসলামি বিশ্লেষণ নিয়ে বিতর্ক'। এটি প্রকাশ পায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

৪. دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية 'ইসলামি সভ্যতার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা'। বইটি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

৫. الإسلام 'ইসলাম'। এটি একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমষ্টি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৬. الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامي 'ইসলামি সভ্যতার মিল-অমিল'। এ বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

পি. এইচ. হিট্টি P.h. Hitti

পি. এইচ. হিট্টি[৯৭] একজন লেবাননি ষড়যন্ত্রকারী খ্রিস্টান। তিনি আমেরিকার বারনাস্ট্রং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিষয়ক বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরে এ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি পেনশনে আছেন। ইসলামের কঠোর সমালোচক হিসাবে তার খ্যাতি ছিল অনেক। আমেরিকায় আরবের অনেক বিষয় তিনি শক্ত ভূমিকা রাখেন। তিনি

---

৯৭. পি. এইচ. হিট্টি- Philip Khuri Hitti. উসমানি খিলাফত দ্বারা শাসিত লেবাননে ২২ জুন ১৮৮৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে তার মৃত্যু হয়। হিট্টি ১৯০৮ সালে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বাইরুত থেকে গ্রাজুয়েশন করেন এবং ১৯১৫ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একই সময়ে সেমিটিক ভাষার অধ্যাপক ও ডিপার্টমেন্ট অফ ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগের প্রাধান ছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পরও তিনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার এশটি হাউস কমিটিতে হিট্টি এই মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, প্যালেস্টাইনকে ইহুদিদের জন্মভূমি বা স্বদেশ বলার কোন ঐতিহাসিক কারণ নেই। এ বিষয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও এরিক কাহলারের সাথে তার কয়েক দফা বিতর্ক পত্রিকায় প্রকাশ পায়। তার রচিত অন্যতম গ্রন্থাবলি- The Syrians in America (1924), History of the Arabs (1937), Islam and the West (1962), Islam : A Way of life (1970).

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক আমেরিকার অন্যতম উপদেষ্টা। মানবসভ্যতার মাঝে ইসলাম বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে তিনি একক ব্যক্তিত্ব।

মুসলিমদের যে কোনো প্রকার কল্যাণ তার অপছন্দীয়। Encyclopaedia of Amerika (যা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়) এর الأدب العربي (আরবি সাহিত্য) এর ১২৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, আধুনিক আরবি সাহিত্যের প্রতিকী জীবন ফিরে পেয়েছে ঊনিশ শতকে। আর এই আধুনিকায়নের নেতৃত্বে ছিল লেবাননের নাসারা খ্রিস্টানরা। তারা আমেরিকান মিশনারিদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। হিট্টির এ বিতর্কিত মন্তব্য শুধু ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদাকে খাটো করে দেখা হয়েছে এমন নয়; বরং এতে সমকালীন যুগকেও হেয় করা হয়েছে। তার এই মন্তব্য ইসলামি ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায় ও যুগের ক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য। এমন ভাব তার রচিত বইগুলোতে ফুটে উঠেছে। যেমন—

১. تاريخ العرب 'আরব ইতিহাস'। বইটি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ পায়। কয়েকবার এটি মুদ্রিত হয়। ইসলাম ও তার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে উপহাস ও সমালোচনায় ভরপুর। যার সব কিছুই বিদ্বেষপূর্ণ ও কদাকার। প্রমাণ হিসাবে দেখা যেতে পারে Al-Islam পত্রিকা। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান হতে প্রকাশিত এপ্রিল সংখ্যার পৃষ্ঠা ১৩৮ ও ১৯৫৮ সালের মার্চ সংখ্যার ১৪৬ পৃষ্ঠা।

২. تاريخ سوريا 'সিরিয়ার ইতিহাস'।

৩. أصل الدروز وديانتهم 'দারুয সম্প্রদায়ের ইতিকথা ও তাদের ধর্মমত'। এটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায়।

এ. জে. ওয়াসিংক A.J. Wensink

এ. জে. ওয়েনসিংক[৯৮] ইসলাম ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোর শত্রু। তিনি মিসরের ভাষা একাডেমির একজন সদস্য ছিলেন। ড.

---

৯৮. এ. জে. ওয়েনসিংক- Arent Jan Wensinck. তিনি ৭ আগস্ট ১৮৮২ সালে নেদারল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ১৯০৮ সালে লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং

আত-তাইয়ার হোসাইন আল-হাওযির المستشرقون والاسلام কিতবটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। এ গ্রন্থের কারণে তাকে বহিষ্কার করা হয়। ওয়েনসিংক যখন কুরআন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ দাবি উত্থাপণ করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থ ও দর্শনশাস্ত্রের সারবস্তু দিয়ে কুরআন সংকলন করেছেন; তখনই আপত্তি ওঠে।

তার এ মন্তব্যটি المستشرقون والإسلام গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করা হয়েছে। ওয়েনসিংক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ عقيدة الإسلام 'ইসলামের বিশ্বাস', এটি ১৯৩২ খ্রিন্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কে. ক্র্যাজ K. Cragg

কে. ক্র্যাজ চরম ইসলামবিদ্বেষী আমেরিকান অধিবাসী। এক সময় তিনি কায়রোর আমেরিকান ভার্সিটিতে লেকচার দিতেন। বর্তমানে 'আল-আলামুল ইসলামি' পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এটি আমেরিকান মিশনারির অন্যতম পত্রিকা। এছাড়াও তিনি একজন মিশনারি এবং হার্টফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান। তার অন্যতম রচনাবলি دعوة المؤتنة . 'মিনারের আহ্বান'। এটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এল. ম্যাসিগনন L. Massignon

এল. ম্যাসিগনন[৯৯] ফ্রান্সের অন্যতম প্রাচ্যীয় পণ্ডিত। উত্তর আফ্রিকার ঔপনিবেশিক মন্ত্রণালয়ের একজন উপদেষ্টা। মিসরে ফ্রান্সের মিশনারি

University of Utrecht এ অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলামের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীত তিনি লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ইসলামের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তার রচিত গ্রন্থাবলী- The Muslim Creed : Its Genesis and Historical Development (1932), A Handbook of Early Muhammadan Tradition (1927), Muhammad and The Jews of Medina.

৯৯. এল. ম্যাসিগনন- Louis Massignon. ২৫ জুলাই ১৮৮৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩১ অক্টোবর ১৯৬২ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

পরিষদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। ইসলামি বিশ্বের প্রায় সব দেশই তিনি ভ্রমণ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি পাঁচ বছর ফ্রান্স বাহিনীর সেবা করেছেন। এল. ম্যাসিগুন মিসর ভাষা একাডেমির ও দামেশকের আরবি গবেষণা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামি তাসাউফ ও দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তার বিশেষ গ্রন্থ المنصور الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام 'সুফি মানসুর হাল্লাজ ইসলামের অন্যতম শহিদ'। দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক তার অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি Encyclopaedia of Islam এর অন্যতম গবেষক ও সম্পাদক।

ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড D. B. Macdonald

ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড[১০০] প্রথম সারির ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। আমেরিকান মিশনারির প্রাণ সঞ্চারকারী বেশ কয়েকটি গ্রন্থ তার হাতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি Encyclopaedia of Islam গ্রন্থের গবেষক ও সম্পাদক। তার রচনাবলি—

তিনি ১৯০২ সালে Honore D' Urfe এর উপর প্রবন্ধ লিখে Licencie es Letters- এ গ্রাজুয়েশন করেন। ১৯০৪ সালে তিনি মরক্কোর মরুভূমিতে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পতিত হন ও এরপর আরবি শিক্ষায় নিজেকে নিবেদিত করেন। তিনি বৈরুতে একজন খ্রিস্টান পাদ্রীর হাতে ক্যাথলিক খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত হন। লুইস ১৯১৯ সালে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তার অন্যতম রচনাবলি- La Passion d'al-Hosayn- Ibn- Mansour al Hallaj, Les Trois Prieres d' Abraham, La GuerreSainte Supreme de I'Islam Arabe.

১০০.ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড- Duncan Black Macdonald. তিনি ১৮৬৩ সালে জন্ম ও ১৯৪৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। ম্যাকডোনাল্ড গ্লাসকো ও বার্লিনে সেমিটিক ভাষার উপর পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে Hartford Theological Seminary তে শিক্ষকতা করেন, যা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদের খ্রিস্টান মিশনারি কাজে উৎসাহিত করতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি মুসলিম ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে জানার জন্য আরব্য রজনী নিয়ে পড়াশুনা করেন। Hartford Theological Seminary †Z Macdonald Center for the Study of Islam and Christian-Muslim Relatons বিভাগটি তার নামেই নামকরণ করা হয়। তার রচনাবলি- The Religious Attitude and Life in Islam, The Development of Muslim Theology, Jurisprudence & Constitution Theory.

১. تطورعلم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلامي 'ইসলামে কালামের ক্রমবিকাশ এবং ইসলামে সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি'। এটি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায়।

২. الموقف الديني والحياة في الإسلام 'ইসলামে ধর্ম-জীবন'। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রকাশ করা হয়।

এম গ্রিন M. Green

এম. গ্রিন[১০১] তিনি الشرق الأوسط বা 'মধ্যপ্রাচ্য' পত্রিকার সেক্রেটারি।

মাজিদ কুদুরি

প্রাচ্যীয় পণ্ডিত মাজিদ কুদুরি[১০২]। তিনি ইরাকি খ্রিস্টান। ওয়াশিংটনের জুহানবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মধ্যপ্রাচ্য' বিভাগের প্রধান।

এছাড়া ওয়াশিংটনের মধ্যপ্রাচ্য একাডেমির পরিচালক। অন্যতম ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। তার সমালোচিত ও ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর রচনাবলির অন্যতম الحرب والسلام في قانون الإسلام 'ইসলামে যুদ্ধ ও শান্তি'। বইটি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া তার অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে।

---

১০১. এম. গ্রিন-তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১০২. মাজীদ কুদূরী- ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সালে ইরাকের মৌছুল শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মৃত্যু বরণ করেন। পেশায় তিনি এজন আইজীবি ও ভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইরাকে জন্ম গ্রহণ করলেও আমেরিকান অধিবাসী ছিলেন। মাজীদ ইসলামি বিষয়গুলো একজন পরিপক্ক ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি ইতিহাস, রাজনীতি ও বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির উপর খুব ভাল দখল ছিল। তিনি আরবি ও ইংরেজি ভাষায় ৩৫টির বেশি পুস্তক ও শত শত প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। তার অন্যতম রচনাবলি-

১) الاتجاهات السياسة في العالم العربي -١٩٧٠, ٢) الحرب والسلام في قانون الإسلام-١٩٧٧, ٣) دول الخليج العربي -١٩٨٨, ٤) حرب الخليج -١٩٨٨, ٥) المفهوم الإسلامي للعدالة وغيرها

ডে. এস. মার্গালিউথ D. S. Margoliouth

ডি. এস মার্গলিউথ[১০৩] ইংল্যান্ডে অধিবাসী ইসলাম বিরোধী সমালোচক। Encyclopaedia of Islam এর অন্যতম গবেষক ও সম্পাদক। মার্গলিয়ুথ মিসর ভাষা একাডেমি ও দামেশক গবেষণা একাডেমির সদস্য ছিলেন। তার রচনাবলি—

১. التطورات المبكرة في الإسلام 'ইসলামে আধুনিক ক্রমবিকাশ'। বইটি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২. محمد و مطلع الإسلام -'মুহাম্মাদ ও ইসলামের উদয়'। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে।

৩. الجامعةالإسلامية। 'ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়'। এ বইটি প্রকাশ পায় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে।ৎ

আর. এ. লিকলসন R. A. Nickolson

আর. এ নিকলসন[১০৪] ইংল্যান্ড অধিবাসী সমকালীন অন্যতম প্রাচ্যবিদ। دائرة المعارف তথা Encyclopaedia এর অন্যতম গবেষক। তিনি

১০৩.ডি. এস. মার্গলিউথ- David Samuel Margoliouth. ১৭ অক্টোবর ১৮৪০ সালে লন্ডনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২২ মার্চ ১৯৪০ সালে লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি চার্চ অব ইংল্যান্ডের যাযক ছিলেন। এয়াড়া তিনি ১৮৮৯ থেকে ১৯৩৭ সান পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Laudian Professor of Arabic হিসেবে অধ্যাপনার কাজ করেন। তিনি New College, Oxford থেকে গ্রাজুয়েশন করেন। মার্গলিউথ ওরিয়েন্টাল ভাষা যেমন-আরবি, ফার্সি, তুর্কি, আর্মেনিয় ও সিরিয়ান ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯০২ সালে New College, Oxford Doctor of Letters (D. Litt) ডিগ্রি অর্জন করেন। তার অন্যতম রচনাবলি- Mohammed and the Rise of Islam, The Early Development of Mohammedanism, The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam.

১০৪.আর. এ নিকলসন- Reynold Alleyne Nicholson. তিনি ১৮ আগস্ট ১৮৬৮ সালে ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৭ আগস্ট ১৯৪৫ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে পড়াশুনা করেন। নিকলসন Cambridge এ ফার্সি ভাষায় অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইসলামি সহিতা ও ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মাওলানা রুমির মসনবি সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষায়

ইসলামি সুফিতত্ত্ব ও দর্শনের উপর বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তিনি মিসরের ভাষা একাডেমির সদস্য ছিলেন। অন্যান্য অস্বীকারকারীদের মত তিনিও ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বলতে নারাজ; বরং তার মতে ইসলাম একটি আধ্যাত্মিক ধর্ম। তিনি একে জড়বাদীর সাথে তুলনা করেন। তার কাছে এর মানবিক কোন মর্যাদা নেই।

তার রচনাবলি—

১. متصوف والإسلام 'ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব'। এ বইটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২. التاريخ الأدب العربي 'আরবি সাহিত্যের ইতিহাস'। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে।

হারফলি হুল

হারফলি হুল[১০৫]। আমেরিকার 'মধ্যপ্রাচ্য' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তিনি সমকালীন সভ্যতা সংস্কৃতি ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি বিশ্লেষক এবং তদারকি কর্মকর্তা।

এইচ লামেন্স H. Lammens

এইচ. লামেন্স[১০৬] একজন ফ্রান্সীয় প্রাচ্যবিদ। জন্ম ১৮৭২, মৃত্যু ১৯৩৭। Encyclopaedia of Islam এর একজন গবেষক। চরম ইসলাম বিদ্বেষী।

অনুবাদ করেন, যা ৮ ভলিয়মে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি এর লেখা ও আল্লামা ইকবালের (এশীয় উপমহাদেশের কপি) এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। প্রাচ্যবিদ A. J. Arberry তার ছাত্র। তার অনুবাদ গ্রন্থাবলির মাঝে অন্যতম- The Sufi Treatise of Hujviri, Rumi's "Mathnavi", and "Divan-E-Shams, Ibn Arabi's "Tarjuman Al Aswaq, Poetry by the Sindhi Language Poet Shah Abdul Latif Bhitlai, এবং সংকলিত গ্রন্থাবলির মাঝে অন্যতম- The Mystics of Islam, Studies in Islamic Musticism, Islamic Poetry and Mysticism, A literary History of the Arabs.

১০৫. হারফলি হুল, তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১০৬. এইচ. লামেন্স- Henri Lammens. ১ জুলাই ১৮৬২ সালে বেলজিয়ামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৩ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে মৃত্যু বরণ করেন। লামেন্স পনের বছর বয়স

শত্রুতার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী এবং মিথ্যার প্রচারক। তার কর্মকাণ্ড অন্য প্রাচ্যবিদদেরও হার মানায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যেতে পারে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের مجلة جمعية الدراسات الشرقية পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যার ১৫-১৬ পৃষ্ঠা। ফরাসি ভাষায় তার রচিত গ্রন্থাবলি—

১. আল-ইসলাম

২. আত-তায়েফ

জে স্কচট(সাচট) J. Schacht

জে. স্কচট (সাচট)[১০৭] ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী একজন জার্মান প্রাচ্যবিদ। ইসলামি ফিকহ ও উসুল সংক্রান্ত তার একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তিনিও Encyclopaedia of Islam এর গবেষক ও সম্পাদক। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ أصول الفقه الاسلامي "ইসলামি আইনের মৌলিক নীতি'।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের আপত্তিকর কিছু বই

ইসলাম, আল্লাহর রাসুল এবং তার অনুসারী মুসলিমদের সম্পর্কে প্রাচ্য পণ্ডিতেরা যে বিকৃত গবেষণা করেছে, তা নানা ইসলামি নামে (মুখরোচক নামে) বই আকারে প্রকাশ করেছে। স্বল্প জ্ঞান ও অপরিণাম দর্শিতার কারণে আমাদের কেউ কেউ এসব বিকৃত গবেষণার বেশ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও গবেষণার মানদণ্ডে মূল্যায়ন ও গর্বের সাথে তার থেকে রেফারেন্সও দিয়ে থাকেন। পাঠক ও একনিষ্ঠ মুসলিম ভাইবোনদের সতর্কতার জন্য এখানে তাদের আরো কিছু আপত্তিকর গবেষণাগ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো— অনুবাদক।

থেকে লেবাননে স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করেন। সেখানে তিনি আরবি, ল্যাটিন, গ্রিক ভাষা শিখেন ও বৈরুতের Saint Joseph University থেকে দর্শনশাস্ত্রে পড়াশুনা করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৮৮৬ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত আরবিভাষায় শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যীয় শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকতা করেন। তিনি কিছুদিন কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। তার রচিত বই- Islam: Beliefs and Institutions, The Age of Muhammad and the Chronology of the Sira, Fatima and the Daughters of Muhammad.

১০৭. জে. স্কাচট (সাচট)-তার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

ক. ইসলামি বিশ্বকোষ

১. دائرة المعارف الاسلامية - যার ইংরেজি নাম Encyclopaedia of Islam এটি বহুবার নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তা নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

২. موجز دائر المعارف الإسلامية- এর ইংরেজি নাম Shorter Encyclopaedia of Islam

৩. دائرة معارف الدين والأخلاق - ইংরেজি নাম Encyclopaedia of Religion and Ethies - এটি ইসলাম বিষয়ক লিখিত প্রবন্ধ সংকলন।

৪. دائرة معارف العلوم الاجتماعية -এর ইংরেজি নাম Encyclopaedia of Social Sciences

খ. আরব ও ইসলাম সংক্রান্ত আলোচনা

৫. دراسة في التاريخ ইতিহাস স্টাডি।

A. Toynbee এর ইসলাম ও রাসুল সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ—

১. حياة محمد এটির গ্রন্থাকার।

২. الإسلام বইটির গ্রন্থকার A. Geom.

৩. دين الشريعة বইটির গ্রন্থকার D.M. Donaldson.

৪. تاريخ شارح الكبير - বইটির গ্রন্থকার Bishop Turpin.

৫. الإسلام -H. Lammens এর ফ্রেন্সী ভাষার এ বইটি গ্রন্থ।

৬. الإسلام - আকিদা সংক্রান্ত গ্রন্থ। ইংরেজি ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশি হয়। গ্রন্থকার S.M. Zweimer.

৭. دعوة المؤتنة 'মিনারের ধ্বনি'। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন K. Cragg.

৮. الإسلام اليوم ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন A.J. Arberry.

৯. ترجمة القرآن - বইটি ইংরেজি ভাষায় A.J. Arberry গ্রন্থনা করেন।

১০. تاريخ مناهب التفسيرالإسلامى -বইটি সর্বপ্রথম জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে আরবিভাষায় অনুবাদ করা হয়। গ্রন্থকার Gold Ziher.

১১. تاريخ العرب - বইটি আরবি ও ইংরেজি ভাষায় একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বইটির গ্রন্থকার Ph. Hitti.

১২. اليهودية في الإسلام - 'ইসলামে ইহুদিবাদ'। বইটি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ইবরাহিম পাশা এটি রচনা করেন।

১৩. عقيدة الإسلام -'ইসলামি বিশ্বাস'। A.J. Wensink এর রচনায় ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

১৪. الحرب السلام في الإسلام - 'ইসলামে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শান্তি'। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন মাজিদ কুদুরি ইরাকি।

১৫. تطورعلم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام -'ফিক্‌হ ও ইলমে কালামের ক্রমবিকাশ এবং ইসলামে সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি'। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন D.B. Macdonald.

১৬. المنصور الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام - 'সুফি মানসুর হাল্লাজ ইসলামের অন্যতম শহিদ'। ফ্রান্স ভাষায় বইটি L. Massignon প্রকাশ করেন।

১৭. الاتجهات الحدثية في الإسلام - 'ইসলাম ধর্মে আধুনিকতার দিক-দর্শন'। প্রথমে এটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করা হয়। পরে আরবি ভাষায় রূপান্তর করা হয়। বইটি H. A. R. Gibb রচনা করেন।

১৮. طريق الإسلام - বইটি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করা হয়। পরে আরবিতে অনুবাদ করা হয়। বইটি প্রাচ্যবিদদের একটি বিশেষ গ্রুপ সংকলন করেন। H.A.R. Gibb তাদের অন্যতম ছিলেন।

১৯. التصوف في الإسلام - 'ইসলাম ধর্মে আধ্যাত্মিকতা'। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় এবং পরে আরবিভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর গ্রন্থকার ছিলেন R. A. Nicholson.

২০. مصادر تاريخ القرآن - 'কুরআনের ঐতিহাসিক উৎস'। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন Arthur Jeffry.

২১. أصول الاسلام في بيئة مسيحية – 'খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামি মূলনীতি'। ইংরেজি ভাষায় R. Bell গ্রন্থটি রচনা করেন।

২২. مقدمة القرآن 'আল কুরআরনের ভূমিকা'। গ্রন্থটি R. Bell ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন।

২৩. التطورات المبكرة في الإسلام –'ইসলামের ক্রমবিকাশ'। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন D. S. Margoliouth.

২৪. محمد ومطلع الإسلام - 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামি জাগরণ'। এটিও ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন D. S. Margoliouth.

২৫. الإسلام - বইটি ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন D. S. Margoliouth.

২৬. الجامعة الاسلامية - বইটি ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন D. S. Margoliouth.

২৭. نظرة الي الاسلام - 'ইসলামের ওপর এক নজর'। ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থটি আরেক ব্যাটম্যান লেখেছেন।

২৮. سلام العصور الوسطى - 'মধ্যযুগের ইসলাম'। G. Von Grunebaum বইটি ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন।

২৯. G. Von Grunebaum এর রচনাসমগ্র ইংরেজি ভাষায় الاسلام নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৩০. الأعياد المحمدية - 'মুহাম্মাদী উৎসব'। এই বইটিও G. Von Grunebaum এর লেখা।

৩১. الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامى - 'ইসলামি সভ্যতার মিল-অমিল'। ইংরেজি ভাষায় বইটি লেখা হয়। এটিও তার লেখা।

৩২. دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية 'ইসলামি সভ্যতার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। ইংরেজি ভাষার এ বইটিও তার লেখা।

৩৩. محاولات في شرح الإسلام المعاصر - 'সমকালীন ইসলামি বিশ্লেষণ নিয়ে বিতর্ক'। একই লেখকের লেখা রচনাসমগ্র ইংরেজি ভাষায় এই নামে প্রকাশ করা হয়।

প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণার মাপকাঠি

প্রাচ্যবিদদের একটি বড় অংশ— গবেষণার ক্ষেত্রে দুর্লভ, অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত মাপকাঠির (গ্রন্থাবলি-মতামত) উপর ভর করে ইসলামি শরিয়ার নানা বিষয় আলোকপাত করতে অভ্যস্ত। এটা তো সর্বজনসিদ্ধ কথা, একজন বিজ্ঞ নিষ্ঠাবান আলেম অবশ্যই সকল প্রকার প্রবৃত্তিপূজা ও অনর্থক আকর্ষণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবেন। যে বিষয় তিনি গবেষণা করতে চান সে-সব বিষয়ে আয়াত-হাদিস ও নির্ভরশীল উৎসগ্রন্থের অনুসরণ করবেন। এরপর তুলনামূলক পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশ পাবে তা-ই হবে প্রকৃত সম্ভাব্য ফলাফল। এটিকে বিশ্বাস করতে হবে।

কিন্তু ঐ সব প্রাচ্যবিদগণ তাদের মস্তিষ্কে কিছু নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা, মতাদর্শ আগে থেকেই ঠিক করে রাখেন। সেই লক্ষেই তারা দলিল-প্রমাণাদির বিন্যাস করেন, আর তখনই বিপত্তি ঘটে, আপত্তি ওঠে। তারা এমন সব দলিল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেন যার দ্দদ্ধতার এতটুকু গুরুত্ব অনুভব হয় না যতটা তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব। এর কারণ, তাদের ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের পৃষ্ঠপোষকতা। আরেকটি কারণ হলো, তারা একটি আংশিক (الجزئ)) বিষয়/ঘটনাকে সামনে রেখে ব্যাপক (الكلي) বিষয়কে বের করার চেষ্টা করেন (যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়); তবে এখানেই রয়েছে একটি বড় ভিন্নতা। যদি তাদের প্রবৃত্তির তাড়না, আর বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকত, তবে তারাও ঐ গবেষণা দ্বারা উপকৃত হত। এ ব্যাপারে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করবো।

হাদিস তৃতীয় হিজরি শতকে সৃষ্ট

গোল্ড যিহার তার বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য এই কথা প্রচার করে থাকেন যে, ইসলামি শরিয়ার দ্বিতীয় উৎস হাদিস হিজরি তৃতীয় শতাব্দির শুরুর দিকে সংকলন করা হয়েছে। হাদিস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী নয়। তিনি দাবি করেন, আহকামে শরিয়া বা ইসলামি জীবনব্যবস্থার ফিকহি রূপ ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিম জনসংখ্যার মাঝে প্রচলিত ছিল না। আর আহকামে শরিয়াহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অজ্ঞতা বড় বড় ইমামদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ তাঁরা ইসলামি শরিয়া ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি এসব বিধ্বংসী বক্তব্যের সমর্থনে কতিপয় পরস্পর বিরোধী, সংঘর্ষিক বর্ণনার সাহায্য নিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ

গোল্ড যিহার ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত দেয় কিতাবুল হায়াওয়ান থেকে, এভাবে যে— আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে ইসা ইবনে আলি আল কামাল আবুল বাকা আদ দিময়ারি কাহেরি শাফি[১০৮] (৭৪২-৮০৮) ইমাম আবু হানিফা রহ.[১০৯] থেকে একটি বর্ণনা এভাবে পেশ

---

১০৮. আল্লামা দিময়ারি রহ. মিসরের বর্তমান রাজধানী কায়রোর দিময়ারি এলাকায় ৭৪২ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬৬ বছর বয়সে ৮০৮ হিজরিতে কায়রোতে ইনতেকাল করেন। সূত্র : ইমাম ইবনে মাজাহ ও কিতাবুহুস সুনান, পৃষ্ঠা ২৫৭।

১০৯. ইমাম আবু হানিফা রহ.; আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবেত রহ.। তিনি ৮০ হিজরিতে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরিতে ইনতেকাল করেন। তিনি তাবেয়িদের অন্তর্ভুক্ত, অর্থ্যাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবিকে দেখেছেন। প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাকে ইমামে আজম বলা হয়। ইসলামি ফিকহ্ তথা আইন-কানুনের ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ অনুসারীদের হানাফি বলা হয়। আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণিত ফিক্হ তারই শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানি রহ. নিজ রচনাবলিতে সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন। তা-ই আজ হানাফি ফিক্হ নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দিকে সম্বোধিত রচনাবলির অন্যতম হলো, ফিকহে আকবার, ফিকহ আওসাত, ওয়াসিয়াত ও রিসালাতুত তাওহিদ প্রভৃতি।

করেন— তিনি বলেন, বদরযুদ্ধ উহুদ যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়নি, বরং উহুদ যুদ্ধই প্রথম সংঘটিত হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, খুব কম সংখ্যক লোকই এ ধরনের বর্ণনা সম্পর্কে অবহিত।

আর আবু হানিফা রহ. যিনি ইসলামের ঐ সকল প্রসিদ্ধ ইমামদের একজন, যিনি ইসলামি যুদ্ধ-বিগ্রহের আহকাম সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ইসলামি যুদ্ধ ফিকহি ক্ষেত্রেও বেশ প্রভাব রাখে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদবৃন্দ যারা তাঁর ইলমি গবেষণাকে প্রচার-প্রসার করেছেন, তাদের অন্যতম ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ.। এটা একেবারেই অসম্ভব, জ্ঞান এটাকে কোনোভাবেই স্বীকার করে না যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাত কিংবা মাগাযির (যুদ্ধ-সংগ্রামের) এমন ঘটনাবলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবেন, অথচ সেই যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ফিকহি সমাধান পেশ করেছেন।

এ বিষয়ে আমি দুটি কিতাবের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। গ্রন্থদ্বয় ইসলামি রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংকলন।

প্রথমটি : كتاب الرد علي سير الأوزاعي এটি ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব রহ. রচনা করেন।

দ্বিতীয়টি : السير الكبير এটি রচনা করেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ. (তাঁরা উভয় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্র)।

ইমাম সারাখসি রহ. এ কিতাবটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামি আইনে রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, অগ্রবর্তী গ্রন্থ। সর্বশেষ এটি جامعة الدول العربية এর তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানি রহ. এর গবেষণা প্রকাশ করে।

আর এ দুটি গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফার ছাত্রগণ এ বিষয়টি (যা ইমাম দিময়ারি বর্ণনা করেছেন) পরিষ্কার করেছেন। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খোলাফায়ে রাশেদিনের সমকালীন ঐতিহাসিক ইসলামি যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আবু হানিফার জ্ঞানের ধারক বাহক।

(ইমামের কোনো কথা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের কথাই বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত)

গোল্ড যিহার উল্লিখিত কিতাব দুটি সম্পর্কে জানেন না, এমনটি নয়। তিনি যদি সত্যানুসন্ধানি হতেন, তবে অবশ্যই এ কথা বলার অবকাশ পেতেন না যে, ইমাম আবু হানিফা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিয়ার ও সিরাত তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং যুদ্ধকালীন সামরিক পর্যালোচনার বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। আর যদি তিনি বলেন, আসলেই এই বর্ণনাটি ইমাম আবু হানিফার বর্ণনা, যা দিমইয়ারি তার حياة الحيوان (প্রাণীজীবন) কিতাবে উল্লেখ করেছেন; সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো দিময়ারি কোনো ইতিহাসবিদ ছিলেন না। তার গ্রন্থটিও ফিক্‌হি কোনো কিতাব ছিল না। এমনকি এটা ইতিহাসের বইও নয় (বরং আসল কথা হলো এটি একটি প্রাচীন সংকলন)। তিনি শুদ্ধা-শুদ্ধির যাচাই-বাছাই ছাড়াই তার কিতাবের আলোচনা সংশ্লিষ্ট দুর্লভ ঘটনা, বর্ণনা, কাহিনি প্রভৃতি সংকলন করেছেন।

আর এ কথাও কারো কাছে অস্পষ্ট নয়, ইমাম আবু হানিফা, তার সমকালীন ব্যক্তি বিশেষ, অনুসারী ও তৎপরবর্তীগণের চিন্তা-ভাবনা ও পদ্ধতিগত পার্থক্যের ভিন্নতাও রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্ট শত্রুতাও প্রমাণিত হয়েছে। আর এই শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণেই সকল অবান্তর ঘটনা প্রবাহ ও বর্ণনার উৎস সৃষ্টি হয়েছে। আর ঐসব ঘটনা বর্ণনাকারী, গল্পকার, লিপিকার এমন কিছু কাল্পনিক ও অবাস্তব ঘটনা বর্ণনা করেছেন যার কোনটা দ্বারা ইমাম আবু হানিফার রহ. এর মর্যাদাকে আকাশচুম্বি করা হয়, আর কোনটা দ্বারা তাকে জমিনে আছড়ে ফেলা হয়। এর অধিকাংশই তার অতি ভক্তিকারী কিংবা বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বানানো, রূপক, কাল্পনিক, গুজব ও কৌতুক বৈ কিছুই নয়। গবেষক ও বিজ্ঞ আলেদের নিকট এর কোনো মূল্য নেই (তাই দিময়ারির মন্তব্যটিও অনুরূপ একটি কাল্পনিক বর্ণনা, যার কোনো ভিত্তি নেই)।

গোল্ড যিহার ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সংকলিত, বিন্যস্ত গবেষণা দ্বারা পরীক্ষিত সর্বপ্রকার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আর নির্ভর করেছেন মিথ্যা, অসত্য প্রমাণহীন বর্ণনা ও বক্তব্যের উপর। এজন্যেই তিনি এমন বাচ্চাসুলভ মন্তব্য করেছেন, যা শিশুশ্রেণির

জ্ঞানান্বেষী শুনেও অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে। তার মন্তব্যটি হলো, সুন্নাতে নববি/হাদিস শরিফের এই বিশাল জ্ঞান শাখাটি প্রথম তিন শতাব্দির পর মুসলিমদের দ্বারা তৈরি করা একটি জ্ঞান উৎস।

ইমাম যুহরি জাল হাদিস তৈরি করতেন

২. একই প্রাচ্যবিদ গোল্ড যিহারের আরেকটি উদাহরণ। তিনি ইতিহাসের গ্রন্থাবলি এবং الجرح والتعديل (ব্যক্তির মান নির্ধারণ) এর প্রাচীন গ্রন্থাবলি হতে সংকলিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয যুহরি রহ.-এর একনিষ্ঠতা, সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠা প্রভৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। জাপানি গোল্ড যিহার দাবি করেছেন, ইমাম যুহরি এমনটি ছিলেন না, বরং তিনি উমাইয়া খলিফাদের জন্য জাল হাদিস তৈরি করতেন। তার দাবি অনুযায়ী তিনি

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة

'তোমরা তিনটি মসজিদে ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পার'।[১১০]

তৎকালীন খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান[১১১] এর জন্য উল্লিখিত হাদিসটি জাল করেছেন। এ হাদিসটি অবশ্যই ইমাম যুহরি রহ. বর্ণনা

---

১১০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৪৮৪, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৭৪১, সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ১৪১৬, ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৩৯৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৭০১৮, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ১৬৫৩, সুনানে কুবরা নাসায়ি, হাদিস নং ৭৭০, বায়হাকি সুনানে সুগরা, হাদিস নং ২৯৭, বায়হাকি সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯৫১৫, মুসনাদে আবি দাউদ তয়ালিসি, হাদিস নং ২৬১৮, মুসনাদে আবি ইয়ালা, হাদিস নং ৫৮৩৪, মুসনাদে হোমাইদি, হাদিস নং ৯১৯, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৮৯৪৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস নং ১৮৩৯৩, তহাবি মুশকিলুল আসার, হাদিস নং ৫৫৭, ও দালায়েলুন নবুওয়াহ হাদিস নং ৮২৯ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা আবদুর রহমান ইবনে সখর রাদি. থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

১১১. আবুল ওয়ালিদ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম ইবনে আবিল আস ইবনে উমইয়া আল-কুরাশী। তিনি ২৬ হিজরিতে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। ৮৬ হিজরিতে তিনি দামেশকে ইনতেকাল করেন। তিনি পঞ্চম উমাইয়া খলিফা ও খিলাফতে বনি উমাইয়ার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যায় আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান উমাভী অন্যান্য খলিফাদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন।

করেছেন। আর ইমাম যুহরি রহ. খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। আমি (ড. মুসতফা আস সিবায়ি) এ ভ্রান্ত ধারণার অবসান কল্পে স্বরচিত কিতাব السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي[১১২] এর ৩৮৫ পৃষ্ঠায় এ আলোচনা করেছি।

আরবরা (ইসলাম) প্রজাদের পশুপাল মনে করে

৩. আরব বিজয়ীগণ অনারবি মুসলিমদের সাথে খারাপ আচরণ ও তাদের অবস্থান-মর্যাদাকে খাটো করে দেখার বিষয়ে প্রাচ্যবিদগণ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এ ব্যাপারে তীর্যক আলোচনা করেছেন প্রাচ্যবিদ প্রকলামেন্ড তার تاريخ الشعوب الاسلامية গ্রন্থে। তার একটি উদ্ধৃতি এখানে প্রদত্ত হলো। তিনি বলেন, আরবরা যখন বিজ্ঞ, জ্ঞানী-গুণীদের পছন্দ করতে লাগল, তখন তারা অনারবি জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক নির্ধারণ করল, অর্থাৎ তারা প্রজাদের পশুপাল ভাবল। আরবিতে যাকে الرعية বলে। এর বহুবচন الرعايا। আরবরা তাদেরকে সেই পুরনো সেমিটিক জাতির সাথে তুলনা করত, যারা (অ্যাসিরীয়)[১১৩] আশুরিয়নদের কাছেও ছিল পছন্দীয়। এই প্রাচ্যবিদ ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য সকল উৎসগ্রন্থ হতে মুখকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। যেসব গ্রন্থে বিজয়ী মুসলিমদের ন্যায়, নীতি, সাম্য ও সহনশীলতা, তাদের পরস্পর লেনদেনের একীভূত হওয়া এবং আরব-

---

হযরত আমাশ আবুয যিনাদ থেকে বর্ণনা করেন, মদিনায় চার জন্য ফকিহ ছিলেন। তাঁরা হলেন, সায়িদ ইবনে মুসাইয়াব, উরওয়া ইবনে যুবাইর, কুবাইসা ইবনে যুয়াইব ও আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান। ৬৫ হিজরিতে তার পিতা মারওয়ান মারা যাওয়ার পর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২১ বছর তিনি খিলাফত পরিচালনা করেন। তার শাসনামলে সব গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আরবিতে অনুবাদ করা হয় এবং প্রথমবারের মত মুসলিম বিশ্বে বিশেষ মুদ্রা চালু করা হয়।

১১২. লেখক এ কিতাবের শুরুতে সংক্ষিপ্তাকারে ইমাম যুহরি রহ.-এর বিষয়টি আলোচনা করেছেন এবং গোল্ড যিহারের বিভ্রান্তির জবাব দিয়েছেন।

১১৩. আশুরিয়ন প্রাচীন কালের ইরাক, সিরিয়া ও তুরুস্কের জনপদে খ্রিস্টান অনুসারীদের বলা হত। তবে এদের কিছু অংশ ইরানে, ব্রিটেন ও ইউরোপের সুইডেন-জার্মান অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। তাদের প্রধান ভাষা ছিল সুরইয়ানিয়া বা সামিয়া। খ্রিস্ট প্রথম শতাব্দিতে আশুরিগণ ইসা আ. এর ধর্ম গ্রহণ করেন।

অনারবের মাঝে কোনো পার্থক্য (Deference) না করা প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।

গোল্ড যিহারের আপত্তির জবাব

الرعية শব্দটি আভিধানিক ব্যাখ্যার দাবিদার। তিনি এ শব্দটি হতে এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, মুসলিমগণ সাধারণ অনারবদেরকে বকরির পালের মত মনে করেন। আর যদি আমরা (رعي) ধাতুর মৌলিক আলোচনা অন্যান্য গ্রন্থে লক্ষ করি, তাহলে আল-কামুসুল মুহিত (القاموس المحيط) গ্রন্থে পাবো এ রকম—

والراعي كل ولي أمر قوم ، والقوم رعية، وراعيته لا حظته محسنا اليه، وراعيته أمره خفظته، كرعاه.

আর راعي বলা হয় প্রত্যেক এমন অভিভাবককে, যে সম্প্রদায়ের কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হয়। সম্প্রদায় বা কওম হলো رعية বা নাগরিক। راعية অর্থ হলো দেখবাল করা, দেখাশুনা করা, সদয় দৃষ্টি রাখা প্রভৃতি।راعيت أمره অর্থ হলো, হেফাজত করা, নিরাপদ রাখা, সংরক্ষণ করা প্রভৃতি।

সুতরাং الراعي শব্দটি অভিধানে যেমন 'বকরির রাখাল' অর্থে আসে, তেমনি এটি 'কওমের প্রধান ও তাদের কর্মনির্ধারক'। আর الرعية শব্দটি 'পশুপাল' অর্থে আসে, অনুরূপ সম্প্রদায়, জাতি প্রভৃতি অর্থেও আসে। আর الرعاية শব্দের অর্থ হলো, অনুগ্রহ করা, নিরাপদ রাখা।

ইসলাম যখন الرعية শব্দটি কোনো জাতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, এর দ্বারা অনারবকে নির্দিষ্ট করে না যার দ্বারা এটা বুঝাবে যে, ইসলাম তাদেরকে বকরির পালের সাথে তুলনা করে; বরং ইসলামেالرعية শব্দটি দ্বারা জাতির সর্বসাধারণকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সম্পর্কে অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে। যেমন: বুখারির বর্ণনায় একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام التى على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل ربع على أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته،

والمرأة راعية على بيت زوجها، وولدها، وهى مسؤولة عنهم، وعند الرجل راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.

অর্থ : সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে তত্ত্বাবধায়ক, আর তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্ত সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সাধারণ জনতার পরিচালক ইমাম বা নেতা তার প্রজা ও নাগরিক সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। নারী তার স্বামী ও সন্তানদের রক্ষক, সে তাদের ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। ব্যক্তির অধীনস্ত গোলাম/কৃতদাস তার কর্তার বা মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। সাবধান! তোমরা সকলেই তত্বাবধায়ক আর তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্ত সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।[১১৪]

ইবনে হাজার আসকালানির ব্যাখ্যা

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ.[১১৫] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه.

---

১১৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৮২৮, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৪১৪, সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ১৬৫২, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৫৪৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৫৭০৯, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৫৮২, সুনানে কুবরা বায়হাকি, হাদিস নং ১৫২৯৮, মুআত্তা মুহাম্মাদ, হাদিস নং ৮৭২ ও বায়হাকি শুয়াবুল ইমান, হাদিস নং ৬৮৬৬- গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. এর থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

১১৫. শিহাবুদ্দিন আবুল ফদল আহমাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানি মিসরি আসকালানি রহ.। তবে তিনি ইবনে হাজার আসকালানি নামে বেশি প্রসিদ্ধ। ২২ শায়াবান ৭৭৩ হিজরিতে মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। ৭৬ বছর বয়সে ৮৫২ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন। মিসরের রাজধানী কায়রোতে তাকে দাফন করা হয়। বর্তমানে বাসাতিন নামক স্থানে তার মাকবারা রয়েছে। তার জীবনের অমর কীর্তি সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারি'।

الراعيহলো রক্ষক, আমানতদার। তার কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা নিরাপদ ও সংরক্ষিত রাখতে সে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং সেই আমানত ন্যায়-নিষ্ঠভাবেই প্রত্যাশিত।[১১৬]

বুখারির অন্য এক হাদিসের মাঝে الرعية শব্দের প্রয়োগ মুসলিমদের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। যেমন—

وما من وال يلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة.

যে তত্ত্বাবধায়ক কোন মুসলিম প্রজাদের দায়িত্ব পেল আর তাদের সাথে প্রতারণাকারীরূপে থেকেই মৃত্যু বরণ করল, তাহলে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন।[১১৭]

প্রাচ্যবিদ প্রকলামেন এসব আলোচনা হতে কীভাবে চোখ বুঝে থাকলেন? আর নিজে নিজে এ দাবি করা বৈধ মনে করলেন যে, মুসলিমগণ অনারবদের বকরির পালের মত মনে করে। তারা তাদের উপর الرعية শব্দটি এককভাবে ব্যবহার করে। এ কথার কোনো বর্ণনাসূত্র বা সনদ নেই; তবে হ্যাঁ, এ শব্দটি বকরিপালের জন্যও ব্যবহার করা হয়। অভিধানের একাধিক অর্থও স্পষ্ট। তবে الرعية শব্দের ব্যবহার অনারবদের জন্য (যেমনটি প্রকলামেন দাবি করেন) নির্দিষ্ট করার কোনো যৌক্তিকতা নেই; বরং এটা সূত্রহীন কাল্পনিক মন্তব্য। এটা সন্দেহবশত ঘটে যাওয়া কোনো বিষয় নয়। অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় এমনটি করা হয়েছে।

---

১১৬. ফাতহুল বারি, খণ্ড ১৩, পৃ. ৯৬।

১১৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৬৪৫ ও হযরত মাআকাল ইবনে ইয়াসার রাদি. থেকে বর্ণিত। এছাড়াও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২০৮, সুনানে দারেমি, হাদিস নং ২৭১০, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৯৮৪২, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৫৮৭, সুনানে কুবরা বায়হাকি, হাদিস নং ১৫৩০০ ও মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস নং ৩৭০৩০ হাদিসটি বর্ণনা করেন।

নবিজি কুরআন-হাদিস সাহিত্যের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন

৪. ডি. এস. মার্গউলিথ (D. S. Margoluth) প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মুর[১১৮] (W. Muir) থেকে বর্ণনা করেছেন, আরবদের গ্রাম্য ব্যক্তিরা সাহিত্য ও ভাষা চর্চার প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করতো। হতে পারে নবি মুহাম্মাদও এই বিষয়ে অধ্যয়ন ও চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি এক পর্যায়ে তিনি এতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন— এটা অসম্ভব কিছু নয়। (অর্থাৎ ভাষা সাহিত্যের শিক্ষা অর্জন করেই বর্তমান কুরআন-হাদিসের রূপ তিনি দান করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

ডব্লিউ মুরের বক্তব্যে ঐসব প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের গবেষণার একটি মাপকাঠি আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠেছে। তিনি অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে এ বিষয়ে কাজে লাগিয়েছেন। কেননা, এ কথা সকলেই জানত আরবগণ ভাষাসাহিত্য আলাদাভাবে শিক্ষা করত না। এমনকি তাদের এ রকম কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও ছিল না, যার শিক্ষকগণ সাহিত্যের আলাদা মৌলিক নীতিমালা ও বিশ্লেষণ তৈরি করবেন। আর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে এ রকম কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না। তা ছাড়া এমন কোনো উদ্ধৃতি (Text)-ও নেই, যার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হবে; বরং এ কথাই সর্বজন স্বীকৃত ও প্রতিপাদিত যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে এবং কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন প্রকার গদ্য-পদ্য ও রচনা-আবৃত্তির বর্ণনা পাওয়া যায় না।[১১৯]

প্রাচ্যের গবেষণায় কর্মরত গবেষকদের পর্যালোচনা ও সমালোচনায় ভিন্ন আরেকটি জিনিস ফুটে উঠেছে; তা হলো— সমালোচনা। কারণ, ঘটনার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে তারা সীমালঙ্ঘনের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কল্পিত

---

১১৮. উইলিয়াম মুর, জন্ম ২৭ এপ্রিল ১৮১৯ সালে এবং মৃত্যু ১১ জুলাই ১৯০৫ সালে। তিনি স্কটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট।

১১৯. তা হলে কীভাবে তিনি লোকালয়ে এসে ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন— এ কথা প্রমাণিত হয়? এর সাথে মিলিয়ে বলা হচ্ছে, কুরআন-হাদিসের উৎপত্তি-ও সেই ভাষা-সাহিত্য থেকে, নাউযুবিল্লাহ! এ কথা মিথ্যার পূজারি ও বিশেষ এজেন্টরাই শুধু বলতে পারে— অনুবাদক।

পাঠ্য নিয়েই তারা অধ্যয়ন করতে থাকেন, যার কোনো বর্ণনাসূত্র বা সনদ নেই। এটি একমাত্র কাল্পনিক ও আধিপত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই নয়।

প্রত্যেক দেশেই কিছু আঞ্চলিক ভিন্নতা রয়েছে

তাদের বিভ্রাটপূর্ণ গবেষণার নীতিমালায় আরেকটি সমস্যা চোখে পড়ে, তা হলো, তারা (প্রাচ্যীয় পণ্ডিতরা) ভাবে যে, আরব ও প্রাচ্যের চিন্তা-ভাবনা, অভ্যাস-স্বভাব, আখলাক-চরিত্র পশ্চিমা ও ইউরোপিয়নদের ধ্যান-ধারণা, কথিত নীতি-নৈতিকতার মতই হবে। তারা এটা কোনোভাবেই স্বীকার করতে চায় না যে, প্রত্যেক পরিবেশের একটি আলাদা মাপকাঠি আছে। আছে আগ্রহ ও অভ্যাস-চরিত্র।

ফ্রান্সের মুসলিম প্রাচ্যবিদ নাসির উদ্দিন ড্যানিয়া প্রাচ্যবিদদের কথিত নীতিমালা, গবেষণা পদ্ধতি, বিভিন্ন বস্তুর হুকুম (নির্দেশনা প্রদানে) নির্ধারণে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের যাচাই-বাছাই করার মাপকাঠি (যা থেকে তারা একই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধপূর্ণ সমালোচনা করেন) প্রভৃতির ব্যাপারে খুব সুন্দর কথাই বলেছেন। তারা সকলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে ইউরোপের ধ্যান-ধারণার বিচারে বিচার করে থাকেন। এতে করে তারা প্রকৃত বিষয় (ইসলামের প্রকৃত গবেষণা) হতে অনেক দূরবর্তী ভ্রষ্টতার মাঝে পড়ে যান। কেননা, এটা তো সেই জিনিস নয়, যা তারা ভাবছেন। কেননা, ইউরোপে বর্তমানের মতাদর্শ প্রাচ্যের আল্লাহ প্রেরিত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থার আলোকে হওয়া সম্ভব নয়।

ড্যানিয়া বলেন, প্রাচ্যবিদগণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিরাতের সমালোচনা করার জন্য ইউরোপীয় নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কয়েক শতাব্দি ধরে তারা বিশ্লেষণ করছেন ও তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুকূলে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এক পর্যায়ে তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাতের যেসব বিষয় মুসলিমগণ একমত পোষণ করেছেন তার মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেন। আর এই দীর্ঘ ও সুক্ত বিশ্লেষণ আর গবেষণার ফলে আজ মহানবির বিশুদ্ধ সিরাতের উপর

আঘাত হানা তাদের পক্ষে সম্ভব হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এখন কি তাদের পক্ষে কিছুটা সম্ভব হয়েছে?

(ড. মুসতফা আস-সিবায়ি বলেন) এর জবাবে আমরা বলতে পারি, প্রাচ্যবিদগণ তেমন নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি; বরং আমরা যখন ঐ সকল ব্যক্তিদের নতুন মতামতের দিকে গভীর দৃষ্টিতে (ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জাপান, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের প্রাচ্যবিদের দিকে) তাকাই, তখন তাদের গবেষণাকৃত বিষয়গুলো মিশ্রিত অন্ধত্যের মতো কিছু গবেষণা বলে মনে হয়। আর আপনি লক্ষ করবেন (তাদের গবেষিত বিষয়ে) একটি বিষয়কে প্রমাণিত ও প্রতিপাদিত করলে অন্যজন তা প্রত্যাখ্যান করেন। অনুরূপ একজন একটা বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করলে অন্যজন তা প্রমাণ করেন (এভাবেই তাদের গবেষণা চলতে থাকে)।

এরপর ড্যানিয়া তাদের পরস্পর-বিরোধপূর্ণ বেশ কিছু মন্তব্যের উদাহরণ পেশ করেন। আর তার আলোচনা শেষ করেন এই বলে— যদি আমরা প্রাচ্যবিদদের গবেষিত বিরোধপূর্ণ আলোচনার একটি অনুসন্ধানি রিপোর্ট তৈরি করি, তা হলে অনেক দীর্ঘ সূত্রিতার সূচনা হবে। কোনটা আসল কথা বা আসল বক্তব্য তা অবহিত হতে পারব না। তাই আমাদের সম্মুখে আরবদের রচিত সংকলিত সিরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা গ্রহণ করবো (এতেই আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সমাধান পেয়ে যাবো)।

আর যেসব (অধুনা) সংকলক দাবি করছেন যে, তারা নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন বৃত্তান্ত তথা সিরাতকে অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে আগ্রহী, তবে তারা কোনো কোনো বিষয় একমত হতে পারছেন না; যদিও তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়। তারা যেসব বিষয় আপত্তি তুলেছেন এবং স্বীকার করেছেন, তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা বিশ্লেষণ প্রকাশে চেষ্টা করেছেন, তারা কেউ গন্তেব্যে পৌঁছতে পারেনি, আর কখনো পারবেও না।

টমাস, ইসকান্দার ও তরস্কুতের মত ব্যক্তিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাত নিয়ে আলোচনা করা এবং তার রূপ-রেখা তৈরি করা কোনো সম্ভবপর কাজ নয়। এসব নামধারী গবেষক ব্যক্তিরা প্রথমে

নিজেদের মত করে (স্বজাতির চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে) ভাবেন, এরপর তারা তাদের নিজেদের মত করে বুঝতে সক্ষম হন। সেভাবেই পূর্ববর্তীদের জীবন-আদর্শ রচনা করেন (যেমনঃ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী তারা রচনা করেছেন)। তারা (যাদের জীবনী লেখা হচ্ছে) তাদের দেশ, সমাজ, পরিবেশ প্রভৃতির পার্থক্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না।

আরেকটি বিষয় হলো, ঐসকল প্রাচ্যবিদগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে যান। তাদের একান্ত করণীয় হলো, পূর্ব থেকে জন্ম নেয়া সকল মন্দ প্রবৃত্তির দরজা বন্ধ করতে হবে, যা তাদের পাশ্চাত্য চিন্তাধারা থেকে বদ্ধমূল হয়েছে। বিশেষত প্রাচ্যের সেই আরবদের ক্ষেত্রে যাদের জীবনবৃত্তান্ত তারা রচনা করতে চাচ্ছেন, তাতে মহান ব্যক্তিত্বের সঠিক জীবনী অনুসন্ধানের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে। এই ছোট্ট নোটটি স্মরণ না রাখার ফলে তারা প্রতিটি পদক্ষেপে ভ্রান্তি আর সন্দেহের মাঝে পতিত হন।[১২০]

ইউরোপে প্রাচ্যবিদদের মুখামুখি

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে অধিকাংশ ইউরোপীয় ভার্সিটিগুলো ভিজিট (পরিদর্শন) করি। তৎকালীন প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের সাথে মেলামেশা, বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে সংলাপ এবং তাদের সাথে অন্যান্য বিষয়ে বিতর্কে জড়ানোর পূর্বে আমি প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي গ্রন্থে আলোচনা করেছি। আর যখন আমি পুরো ইউরোপ ঘুরে আসলাম তখন আমার পূর্ব লিখিত কিতাব দ্বারা আমার বিশ্বাস সুদৃঢ় ও আরো বৃদ্ধি পেল। ইসলামি কৃষ্টি-কালচার (Islamic culture) আইন-কানুন (laws) সম্পর্কে তাদের আপত্তিকর ও ক্ষতিকর অবস্থান সম্পর্কে (আমার পূর্বের লিখিত মন্তব্যে) পরিতুষ্ট হলাম। কারণ, প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা, ইসলাম ও আরব মুসলিমদের ক্ষেত্রে বিদ্বেষপূর্ণ ছিল।

---

১২০. মুকাদ্দামাতু হাদিরিল আলামিল ইসলামি, আমির শাকিব আরসালান, খণ্ড ০১, পৃ. ৩৩।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (London University)

প্রাচ্যবিদদের মাঝে সর্বপ্রথম যার সাথে আমার সাক্ষাত হয় তিনি হলেন প্রফেসর আন্ডারসন। তিনি হচ্ছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য অধ্যয়ন Institute এর 'ইসলামি বিশ্বের ব্যক্তি আইন-সংক্রান্ত' বিষয়ক প্রধান। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগ হতে পাস করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন তিনি ব্রিটেনের সৈন্যবাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে আরবের মিসরে অবস্থান করেন। (তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন) এক বছর ধরে মিসর ও আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে কয়েকজন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেম আরবিভাষার এক ঘণ্টার ক্লাস নিতেন। তিনি সেই ক্লাসের মাধ্যমে আরবিভাষা শিখেছেন।

মিসরের আঞ্চলিক ভাষায়ও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন সাধারণ মিসরীদের সাথে মিশে। এ সুযোগটা হয়েছিল– যখন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকদের সাথে ছিলেন। আর তিনি ইসলাম বিষয়ক স্টাডি করেছেন মরহুম আহমাদ আমিন, ড. তহা হোসাইন ও শাইখ আহমাদ ইবরাহিম[১২১] প্রমুখের কায়রো অবিস্থিত আমেরিকান ভার্সিটিতে দেওয়া সাধারণ আলোচনা থেকে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (লন্ডনে) ইসলামি বিশ্বের আইন বিষয়ক প্রধান হন। আমি তার ইসলাম বিরোধী বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। এ ব্যাপারে লন্ডনের ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক মরহুম ড. হামুদ গরাবা[১২২] আমাকে অবহিত করেন।

আমি এখানে প্রফেসর আন্ডার্সনের একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, যা তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে। সে ইসলামি আইন বিভাগে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট সনদ গ্রহণ করতে এসেছে; কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট কারণে তার থিসিস বাতিল করা হয়েছে। আর তা হলো, সে তার থিসিস (গবেষণাপত্র) পেশ করেছে 'ইসলামে নারীর মর্যাদা' বিষয়ে। থিসিসে সে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণের আলোকে এ কথা প্রতিপাদিত করেছে যে, ইসলামই

---

১২১. শাইখ আহমাদ ইবরাহিম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১২২. ড. হামুদ গরাবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

নারীকে তার সকল অধিকার পরিপূর্ণ দিয়েছে। আমি তার থিসিস বাতিল করাতে আশ্চর্য বোধ করি।

তখন এই প্রাচ্যবিদকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কীভাবে তার পি এইচ ডি বাতিল করলেন এবং তাকে বিরত রাখলেন? অথচ আপনারা আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বাধীন গবেষণার দাবি তোলেন? তখন প্রফেসর আন্ডারসন বললেন, সে বলে, 'ইসলাম নারীকে এটা দিয়েছে, ইসলাম নারীর জন্য ওটা নির্ধারণ করেছে; তবে কি সে (ডক্টরেট প্রার্থী) ইসলামের নাম দিয়ে আনুষ্ঠানিক ও প্রথাগত বক্তব্য দিচ্ছে? সে কি ইমাম আবু হানিফা আর শাফি? যে সে এ রকম বক্তব্য প্রদান করবে, ইসলামের নামে মন্তব্য করবে?

যখন আমরা স্পষ্টত দেখতে পাই, নারীর অধিকার সম্পর্কে ইসলামের পূর্ববর্তী ফকিহদের কোনো উক্তি নেই (তার মত অনুযায়ী), তবে তো অবশ্যই এ লোক ধোঁকায় পরে আছে। আর দাবি করছে, সে ইসলামের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও শাফি রহ. এর চেয়ে অনেক বেশি বুঝতে পেরেছে। এ বক্তব্য হলো এমন প্রাচ্যবিদের, যিনি এখনও জীবিত আছেন। তবে আমি জানি না, তিনি এখন লন্ডন ভার্সিটিতে আছেন নাকি অবসরে আছেন।

স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (University of Edinburgh)

আমি স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। ভার্সিটিতে একজন প্রাচ্যবিদ ইসলামি স্টাডি বিভাগে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ছিলেন সাধারণের পোশাকে একজন পাদ্রী। তার ঘরের দরজায় আপন নামের সাথে ধর্মীয় উপাধী লেখা ছিল।

স্কটল্যান্ডের গ্লাসকো বিশ্ববিদ্যালয় (University of Glasgow)

স্কটল্যান্ডের গ্লাসকো বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার আরবি স্টাডি বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন ধর্ম পুরোহিত। বিশ বছর যাবৎ তিনি ফিলিস্তিনের কুদ্স এলাকায় মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবস্থান করেন। এক পর্যায়ে তিনি আরবদের মতো করে কথা বলতে শুরু করলেন। এই

সাক্ষাতে তিনি আমাকে জানিয়েছেন। এ ছাড়াও আমি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের হামদুন শহরে অনুষ্ঠিত 'মাসিহ ইসলামি' কনফারেন্সে যোগদান করি।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Oxford University)

ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে একজন ইহুদি নাগরিককে ইসলামি ও আরবি স্টাডি বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত দেখতে পেলাম। তিনি আরবিভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গ শব্দে কষ্ট করে কথা বলছেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লিবিয়াতে ব্রিটেনের সংবাদ মাধ্যমের হয়ে কর্মরত ছিলেন। পরে ইংল্যান্ডে আসেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যায়ে উল্লিখিত বিভাগে প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য। এখানে আমি প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যয়নকারীদের সিলেবাস দেখে আশ্চর্য হই। আল্লামা যমাখশারির তাফসিরে কাশশাফ (যদিও এর ইবারতের বিশ্লেষণ অতটা সুন্দর নয়), হাদিসের মধ্যে বুখারি-মুসলিম ও ফিকহের মৌলিক কিতাবগুলো পড়ানো হয়— হানাফি-হামবলি মাযহাবের কিতাব থেকে। আমি তাকে এই স্টাডির তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এর তথ্যসূত্র হলো Gold Ziher, D. S. Margoliouth, J. Schacht এর মত কট্টর, ভ্রান্তবাদি প্রাচ্যবিদদের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী ভ্রান্তবাদি গবেষণামূলক গ্রন্থাবলি।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (University of Cambridge in England)

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম ও আরবিভাষা স্টাডি বিভাগের প্রধান ও প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ A. J. Arberry তিনি আরবিভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। তার আলোচনা একটু আগেই অতিবাহিত হয়েছে।

তিনি আমাকে কথার এক পর্যায়ে বলেন, আমরা প্রাচ্যবিদরা ইসলাম বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে অনেক ভুল-ভ্রান্তির শিকার হই। এজন্য আবশ্যক হলো, এই ময়দানে আমাদের ভাল করে অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখা ও ডুবে থাকা। আর আপনারা আরব মুসলিমগণ, আমাদের থেকে অনেক বেশি গভীরতা ও পাণ্ডিত্য রাখেন এই বিষয়গুলোতে। তার এ বক্তব্য

সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার বলে মনে হলো, তবে সঠিক বিশ্বাস রাখার কারণেও এমনটি বলে থাকতে পারেন।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়
(University of Manchehter in England)

ইংল্যান্ডের প্রফেসর রোবসুন এর সাথে সাক্ষাত হয় ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন তিনি সুনানে আবু দাউদ তার পাণ্ডুলিপির সাথে মিলাচ্ছেন। হাদিসের ইতিহাস নামে তার বেশ কয়েকটি কিতাব রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি জুলুমবাজ প্রাচ্যবিদদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। আমি প্রাচ্যীয় স্টাডির আক্রমণাত্মক ও প্রকৃত আলোচনার বহির্ভূত কিছু বিষয় তার সম্মুখে উপস্থাপন করতে আগ্রহী হলাম। এক্ষেত্রে আমি Gold Ziher এর কয়েকটি মন্তব্য উপস্থাপন করলাম এবং তার গবেষণামূলক ও ঐতিহাসিক ভুল-ত্রুটি প্রমাণ করলাম। তখন তিনি এ ব্যাপারে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ—

প্রকাশিত-প্রচারিত ইসলামি উৎসগ্রন্থের ব্যাপারে বর্তমান সময়ের প্রাচ্যবিদগণ গোল্ড যিহার থেকে অধিক অবগত ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ইসলামি গ্রন্থাবলি ও সংকলন হতে স্পষ্টতই বুঝা যায় ইসলামি উৎসগ্রন্থগুলো গোল্ড যিহারের সময় এতো পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল না। তখন তাকে বললাম, আমি আশা করছি বর্তমান যুগে আপনাদের গবেষণাপত্রগুলো Gold Ziher ও D. S. Margoliouth ও তাদের সমমনাদের থেকে বেশি ন্যায়-নিষ্ঠ, সত্যের নিকটবর্তী হবে। তিনি বললেন, আমিও অনুরূপ আশা করছি।

ল্যাডিন ভার্সিটি (Leiden University)

নেদারল্যান্ডের ল্যাডিন ভার্সিটির জার্মানি ইহুদি প্রাচ্যবিদ প্রফেসর J. Schacht এর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি ইসলামকে নিষ্পেষিত করার জন্য বর্তমান যুগে Gold Ziher এর পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও ইসলামের প্রকৃত বাস্তবতাকে বিকৃত করছেন। আমি গোল্ড যিহারের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে তার সাথে দীর্ঘ আলোচনায় লিপ্ত হই। আমার দাবি ছিল, ইসলামের মূল বক্তব্যকে (نصوص) গোল্ড যিহার বিকৃত করেছেন। এবং আমাদের বিভিন্ন গ্রন্থ হতেই তা সংকলন করেছেন।

জে. সাচট প্রথমে তা অস্বীকার করেন। পরে সুন্নাহর ইতিহাস গ্রন্থে যা লিখেছেন তার একটি উদাহরণ দিলাম। সে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাল। আবার গোল্ড যিহারের বইটি দেখে নিল। আমরা তখন তার বিশেষ লাইব্রেরিতে বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। গোল্ড যিহার এখানে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। আমি বললাম, এটি কি খুব সাধারণ ভুল? এতে তিনি রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনারা তার প্রতি খারাপ ধারণা কেন করছেন?

তারপর আমি আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান-এর নিকট ইমাম যুহরির অবস্থান বিশ্লেষণের দিকে গেলাম। আমি তার কাছে গোল্ড যিহারের ভ্রান্ত মন্তব্যের বিপরীত বা প্রকৃত ও বাস্তবসম্মত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইমাম যুহরির অবস্থান ও মর্যাদা তুলে ধরলাম। এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার পর তিনি বললেন, এটাও গোল্ড যিহারের ভুল। তবে আলেমগণ কি ভুল করেন না? আমি বললাম, গোল্ড যিহার প্রাচ্যীয় একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিরিখে ইসলামি আইনের সামাধান প্রনয়ণ করা হয়। যখন তিনি ইমাম যুহরি রহ. সম্পর্কে আলোচনা তুললেন তখন তিনি সেই মাদরাসায় তার সূচনা করলেন না কেন? আর কীভাবেই বা তিনি ইমাম যুহরির ব্যাপারে মসজিদুল আকসার ফজিলত সংক্রান্ত হাদিস আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পক্ষে আর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদি.[১২৩] এর বিপরীতে জাল বানানোর অপবাদ আরোপ করলেন? অথচ ইমাম যুহরি ইবনে যুবাইরের মৃত্যুর কয়েক বছর পর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সাথে দেখা করেন। এর আগে ইমাম যুহরি রহ. এর সাথে খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের

---

১২৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনে আল-আওয়াম আল-আসাদি আল-কুরাইশি রাদি.। তার মা ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. এর মেয়ে আসমা বিনতে আবি বকর রাদি.। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমনের পর প্রথম হিজরিতে সর্বপ্রথম মুসলিমদের মাঝে তিনি ভূমিষ্ট হন। উমাইয়াদের সাথে ইবনে যুবাইরের খিলাফত নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি উমাইয়া খিলাফতকে সমর্থন করেননি, বরং তার বিপরীতে মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে খিলাফতের ঘোষণা প্রদান করেন। ৭৩ হিজরিতে খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফি মক্কায় আক্রমণ করে কাবার হারামে তাকে শহিদ করে।

কখনো সাক্ষাত ঘটেনি। সুতরাং তার জন্য জাল হাদিস বানানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

এদিকে জে. সাচট এর মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গিয়েছে। তিনি ক্ষোভে এক হাত অন্য হাতের মাঝে নিয়ে মোচড়াচ্ছেন। তার উত্তেজনা ও ক্রোধ বেড়েই চলছিল। আমি তার সাথে আলোচনার ইতি টানলাম এভাবে যে, আপনিও যাকে ভুল বলে স্বীকার করলেন এ রকম অসংখ্য ভুল বিগত শতাব্দিতে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে। আর এসব ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের একজন থেকে অন্যজন বর্ণনা করছেন এই হিসেবে যে, এগুলো গবেষণামূলক বিশ্লেষণ। আমরা মুসলিমগণ এগুলো পাঠ করি তার সংকলকগণ মৃত্যু বরণ করার পর (তাই এ ব্যাপারে ভাল কোনো সমাধান তাদের জীবদ্দশায় দেয়া সম্ভব হয় না)। আমরা আশাবাদী এ রকম গবেষণাপত্রগুলো 'গবেষণামূলক বিশ্লেষণ' হিসেবে স্থির করার পূর্বে আপনাদের জীবদ্দশায় সংশোধনের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

বর্তমানে এই প্রাচ্যবিদ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর। তার ইসলামি আইনের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রয়েছে। Gold Ziher এর নীতির অনুসরণে এতে রয়েছে সর্বপ্রকার কুৎসা ও অপপ্রচার ও গভীর ষড়যন্ত্র।

আবসালা ইউনিভার্সিটি (University of Uppsala)

সুইডেনের আবসালা ইউনিভার্সিটিতে আমি প্রাচ্যবিদ নিবরাজের[১২৪] সাথে সাক্ষাত করি। তিনি ইবনে খাইয়্যতের[১২৫] 'কিতাবুল ইনতেসার' সম্পাদনা করার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। কায়রোর অনুবাদ ও সংকলন পরিষদের মাধ্যমে বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। তার সাথে আমার

---

১২৪. নিবরাজ-হেনরিক সামুয়িল। ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৯ সালে সুইডেনে জন্ম গ্রহণ করেন। ৮৫ বছরে বয়সে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি পেশায় একজন লেখক ও ভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। প্রাচ্যবিদ নিবরাজ সুইডিস ভাষায় লেখালেখি করতেন।

১২৫. ইবনে খাইয়াত আবুল হোসাইন আবদুর রহিম ইবনে মুহাম্মাদ উসমান আল-খাইয়াত আল-মুতাযিলি। তিনি ভ্রান্ত মুতাযিলা দলের অনুসারী ছিলেন। তৃতীয় হিজরির শেষ দিকে অথবা চতুর্থ হিজরির প্রথম দিকে ইনতেকাল করেন।

দীর্ঘ আলোচনা হয়, যার অধিকাংশ ছিল প্রাচ্যবিদদের গবেষণা, ইসলাম ও ইসলামি ইতিহাস বিষয়ক তাদের লেখনি নিয়ে। গোল্ড যিহারের আলোচনা তুললাম। আমি তার ভুল-ভ্রান্তি ও বিকৃতি সম্পর্কে বাস্তবিক উদাহরণসহ উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, গোল্ড যিহার বিগত শতাব্দির প্রাচ্যবিদদের জন্য তথ্যপুঞ্জী, প্রসিদ্ধ গবেষক ও অনুসরণীয় ছিল।

বর্তমান যুগে (আপনাদের দেশে ইসলামি বিভিন্ন কিতাব প্রকাশিত হবার পর) আর কেউ গোল্ড যিহারকে জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ও অনুসরণীয় মনে করে না। আমাদের মতামত অনুযায়ী গোল্ড যিহার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

আরো কিছু ইউনিভার্সিটি

এই ভ্রমণে উল্লিখিত ইউনিভার্সিটি ব্যতীত আরো বেশ কয়েকটি দেশের রাজধানীর ভার্সিটি পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছে। যেমন বেলজিয়াম (Belgium), ডেনমার্ক (Denmark), নরওয়ে (Norway), ফিনল্যান্ড (Finland), জার্মানি (Jermany), সুইজারল্যান্ড (Suitzerland) ও প্যারিস (Paris) প্রভৃতি। এসব দেশের তখনকার উপস্থিত প্রাচ্যবিদদের সাথে সরাসরি সাক্ষাত করি।

দীর্ঘ ভ্রমণে যা অর্জিত হল

দীর্ঘ ভ্রমণে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ব্যাপারে যা উল্লেখ করলাম এবং পর্যালোচনায় যা সংকলন করেছি তা থেকে আমার কাছে বেশ কিছু বিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছে। যথা—

এক. প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের অধিকাংশই হয় পুরোহিত, অথবা ঔপনিবেশিক কিংবা ইহুদি, এছাড়া খুব কমই আছে।

দুই. বর্তমানে পশ্চিমের দেশগুলোতে প্রাচ্য-বিষয়ক অধ্যয়ন ঔপনিবেশিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে নয়; যেমন: ইস্কান্দানাফিয়া[১২৬]। পক্ষান্তরে

---

১২৬. ইস্কান্দাফিয়া বলা হয় ইউরোপের সমষ্টিগত কয়েকটি দেশকে। ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় Scandinavia। এসব দেশগুলো মূলত দ্বীপ সাদৃশ্য। ভৌগলিকভাবে ইউরোপের উত্তর দিকে অবস্থিত। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন ইত্যাদি দেশ ইস্কান্দাফিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডকেও ইস্কান্দাফিয়ার

ঔপনিবেশিক দেশে এর তৎপরতা খুবই বেশি। যেমন: ফ্রান্স, ইটালি ও ব্রিটেন।

তিন. ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে প্রাচ্যবিদগণ গোল্ড যিহারের সমমনা ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তিদের পরিহার করে চলেন।

চার. প্রাচ্য-বিষয়ক অধ্যয়ন সাধারণত প্রথম সূচনা হয় গীর্জা হতে। ঔপনিবেশিক দেশে তা গির্জাকে কেন্দ্র করে সূচনা হয়। আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়। উভয় থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা তারা পায়।

পাঁচ. ঔপনিবেশিক দেশগুলো— যেমন: ব্রিটেন ও ফ্রান্স সর্বদা প্রাচ্যীয় অধ্যয়নের নির্দেশ ও ইসলামি শক্তিকে ধ্বংস এবং মুসলিমদের সুনাম বিকৃতকরণের প্রতি উৎসাহিত করে থাকে।

ফ্রান্সের বিলাশীর[১২৭] ও মাসিনিয়ুন[১২৮] সর্বদা এই কাজেই নিয়োজিত। বর্তমানে তারা উভয়ে ফ্রান্সের প্রাচ্যীয় অধ্যাপকদের গুরু হিসেবে পরিচিত। এছাড়া তারা উভয়ে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মুসলিম ও আরব বিশ্বের বিভিন্ন শাখার খবরাখবর সংগ্রহে নিয়োজিত।

অধিভুক্ত ধরা হয়। কেননা, এসব দেশের মানুষের আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন।

১২৭. বিলাশীর-আর. এল. বিলাশের (R. L. Blochere)। ১৯০০ ফ্রান্সে জন্ম ও ১৯৭৩ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মৃত্যু বরণ করেন। ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদদের কাছে তিনি আরবিভাষা ও সাহিত্য বিষয় খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি একজন ইতিহাসবিদ ও অনুবাদক। তার ব্যাপারে কুরআনে কারিমের অপব্যাখ্যা করার অভিযোগ রয়েছে। তিনি কুরআনে কারিমের আয়াতের বিন্যাস, ভুল অনুবাদ ও তাফসির বিভ্রাটের কাজ করতেন।

১২৮. মাসিনিয়ূন-লুইস মাসিগনোন (Louis Massignon or Louis Fernand Jules Massignon)। ২৫ জুলাই ১৮৮৩ সালে ফ্রান্সে জন্ম গ্রহণ করেন ও ৭৯ বয়সে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ৩১ অক্টোবর ১৯৬২ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ও বিলাসির সুইডেন বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। প্রাচ্যবিদ সুইস ফরাসি ভাষার পাশাপাশি আরবি, তুর্কি, ফার্সি, জার্মানি ও ইংরেজি ভাষা জব্দ করেন। সুফি মানসুর হাল্লাজকে নিয়ে তিনি গবেষণাপত্র পেশ করেন।

আর ইংলান্ডে আমরা লক্ষ করেছি, প্রাচ্যীয় অধ্যয়নের একটি সম্মানজনক অবস্থান সে দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে রয়েছে। যেমন: লন্ডন, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, এডিনবার্গ ও গ্লাসকো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব স্থানে তত্ত্বাবধায়ক হলেন ইহুদি, ইংরেজ ঔপনিবেশক ও মিশনারি। তারা সকলেই গোল্ড যিহার, ডি. এস. মার্গলিউথ ও তাদের পরবর্তী জে. সাচটের পদাঙ্ক অনুসারী।

ঐসব প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ পশ্চিমা দেশগুলোর প্রাচ্য বিষয়ক অধ্যয়নকারী ছাত্রদের মূল তথ্যসূত্র। আর পশ্চিমা দেশগুলোতে যেসব আরব ডক্টরেট অর্জন করতে আগ্রহী, তারাও এদের গ্রন্থাবলির প্রতি অনুগত। ইসলামি ন্যায়-নীতি এবং প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্রের শিকড় উন্মোচন করতে কখনো তারা আপন চিন্তাধারা অনুযায়ী ডক্টরেট অর্জন করতে পারবে না।

আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুলুদ্দিন ফেকালটির গ্রাজুয়েট, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরবিয়াত ও সাহিত্য বিভাগের সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ড. আমিন মিসরি ইংল্যান্ড ভার্সিটি হতে ফালসাফা বিষয়ে ডক্টরেট সার্টিফিকেট অর্জন করার পর তার থিসিস অর্জনের ব্যাপারে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা বর্ণনা করেন। ফালসাফার স্টাডির জন্য তার কয়েক বছর চলে যায়। অবশেষে এ বিষয়ে তিনি ডক্টরেট সার্টিফিকেট অর্জন করেন। এ সময় তার নিকট স্টাডির নানা বিষয় ফুটে ওঠে। বিশেষকরে ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারের স্টাডির বিষয়ে।

তিনি প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থাবলিতে নানা ষড়যন্ত্র ও আক্রমণাত্মক বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। বিশেষকরে জে. চাসটের গবেষণায়। ড. আমিন মিসরি স্থির করলেন তার থিসিসের বিষয় হবে জে. চাসটের تاريخ الفقه الاسلامي গ্রন্থের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা। এ ব্যাপারে তিনি প্রফেসর আন্ডারসনের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলেন, যাতে এ বিষয়টি উপস্থাপনে (থিসিস গ্রহণে) তত্ত্বাবধায়ক হন এবং বিষয়বস্তুর উপর ঐক্যমত পোষণ করেন। কিন্তু এই প্রাচ্যবিদ জে. চাসটের গ্রন্থের সমালোচনার ব্যাপারে থিসিস নেওয়াকেই অস্বীকার করলেন। আর এর সাথে একমত পোষণ করা তো অনেক দূরের কথা।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

যখন তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি হতে হতাশ হলেন তখন তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গেলেন এবং সেখানে যোগদান করলেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে ইসলামি স্টাডিতে ডক্টরেট অর্জনের জন্য উল্লিখিত বিষয়ে থিসিস প্রার্থনা করেন। তারাও এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেননি। তিনি ভাবলেন হয়তো এক সময় তারা মেনে নিবেন; কিন্তু তারা স্পষ্টতই জানিয়ে দিল, তুমি ডক্টরেট অর্জনে সফলতা লাভ করতে হলে জে. চাসটের গ্রন্থ পর্যালোচনা পরিহার করো। কেননা, এই ইউনিভার্সিটি কখনই তোমাকে এর সুযোগ দিবে না। তখন আমি আমার থিসিসের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে 'মুহাদ্দিসিনদের নিকট হাদিস পর্যালোচনা করার মানদণ্ড' নির্ধারণ করলাম। তারা এতে একাত্মতা পোষণ করলেন। ড. আমিন সহজেই সফলভাবে ডক্টরেট অর্জন করলেন। এখন তিনি দামেশকের শরিয়া ফ্যাকালটির উসতাদ।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা, যা প্রাচ্যবিদদের সাথে আমার জীবনের বাস্তবতা প্রতিপাদিত হয়েছে। বিশেষ করে গোল্ড যিহারের গ্রন্থাবলি ও মতামত السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদে এককভাবে এদের আলোচনা করেছি। এতে প্রাচ্যবিদ ইহুদিদের জুলুম, বাস্তবতা বিরোধী কুৎসা রটনা, উৎসসূত্রকে বিকৃত করা, তাদের উদ্দেশ্য অনুপাতে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদান, এমন সব গ্রন্থপুঞ্জির উপর নির্ভরশীলতা, যা ইলমি দৃষ্টিতে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই— আমি এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছি। এ কথা স্পষ্ট যে, আমাদের বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদ ইমামদের নিকট যে গ্রহণীয় উৎসগ্রন্থ রয়েছে, তা তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন (এবং পরিহার করে গবেষণা করেন)।

আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতায় শীর্ষে

আমেরিকা তো প্রাচ্যবিদ্যার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতায় শীর্ষে। সেখানের ইউনিভার্সিটিগুলোতো সব থেকে বেশি ইসলাম বিদ্বেষী ও কঠোরতা অবলম্বনকারীগণ ইসলামি স্টাডির তত্ত্বাবধায়ক। যেমনটি ইতিপূর্বে তাদের নামের তালিকা ও তাদের সংকলিত গ্রন্থাবলি হতে স্পষ্ট হয়েছে।

দুঃখের বিষয় হলো, ইসলামি বিশ্বের শিক্ষার্থীগণ যারা তাদের দেশে ইংরেজি ভাষায় পাঠ গ্রহণ করেন, তারা আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের ভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হতে খুবই তৎপর থাকেন। সুতরাং ইসলামি স্টাডিতে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীরা তাদের ডক্টরেট অর্জন করার জন্য উল্লিখিত বিষাক্ত গ্রন্থপুঞ্জি ব্যতীত অন্য কিছুই পান না। তারা আরবিভাষা জানেন না। সুতরাং মুসলিম ওলামা ও ফকিহদের গ্রন্থাবলি থেকে তাদের কাছে ঐ বিষাক্ত বিশ্লেষণগুলো সহজ ও উৎসমূলক গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়।

আমাদের আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষায় ডক্টরেটের সার্টিফিকেটগুলো প্রদান করা হলে আমার বিশ্বাস অধিকাংশ ইসলামি বিশ্বের শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে পাশ্চাত্য ভার্সিটি থেকে আমাদের আরদেশের দিকে ফিরে আসত। আর এতে তারা ঔপনিবেশিক, ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্রমূলক প্রভাব থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকতে পারত।

প্রাচ্যবিদদের ব্যাপারে আমার শেষ কথা

সামরিক ও রাজনৈতিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যখন ধর্মযুদ্ধের অবসান হলো, তখন থেকেই ইসলাম ও মুসলিমদের উপর ভিন্ন পন্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ করার আক্রমণাত্মক চিন্তা-ভাবনা পশ্চিমাবিশ্ব প্রস্তুত রেখেছিল। তারা প্রথম যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, তা হলো ইসলামি স্টাডি ও তার সমালোচনা। মধ্যযুগীয় সময় পাশ্চাত্যে খ্রিস্টসমাজ এই দৃষ্টিভঙ্গির নেতৃত্ব দিচ্ছিল। ইসলাম যখন রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে আরম্ভ করল, তখন ইসলামি দেশগুলোর উপর শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা উঠে-পড়ে লেগে যায়।

পশ্চিমারা ইসলামি বিশ্বের উপর একের পর এক, এক দেশের পর অন্য দেশে আক্রমণ শুরু করল। এমনকি তারা ইসলামি বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করল। এক সময় ইসলাম ও তার ইতিহাস সম্পর্কে পাশ্চাত্যের স্টাডির সূচনা ঘটল। এক পর্যায়ে রাজনৈতিক ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে এই জাতির উপর ঔপনিবেশিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকল।

এভাবে বিগত শতাব্দিতে ইসলামি জ্ঞানশাখার সর্বদিক— ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা আপন স্টাডিকে পূর্ণতায় পৌছিয়েছে। স্বভাবগতভাবে এই স্টাডি হকের স্পর্শ থেকে (আলো) আবৃত থাকে দুটি পর্দার মাধ্যমে। যথা:

এক. ধর্মীয় বিদ্বেষ, যা ইউরোপের শাসন ক্ষমতায় চির বিরাজমান। আর তার নেতৃত্বাধীন সমমনা সৈন্যবাহিনী যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করল, তখন 'লর্ড আলনাবির'[১২৯] একটি মন্তব্য করেছিলেন, যা আজও সকলের মুখে মুখে। আর তা হলো, এখন ধর্মযুদ্ধের অবসান হলো[১৩০]।

ইসলাম ও তার সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ক ধর্মীয় বিদ্বেষ এখনো অনেক পশ্চিমাদের লেখায় বিদ্যমান। পশ্চিমা ধর্মীয় গবেষক, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞজনদের নিকট ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ন্যায় আচরণ যতুটুক আমি পাই তার একটি দৃষ্টান্ত حضارة العرب গ্রন্থ হতে দিব। বইটির সংকলক হলেন গোস্তাফ লে বোন[১৩১]।

---

১২৯. লর্ড আলনবির-এডমন্ড হেনরি হানম্যান অ্যালেনবাই (Edmund Henry Hynman Allenby)। ২৩ এপ্রিল ১৮৬১ সালে ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১৪ মে ১৯৩৬ সালে লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। অ্যালেনবাই একজন যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও দার্শনিক। তিনি ১৮৮০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ব্রিটেনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৩০. الآن انتهت الحروب الصليبية أي من الناحية العسكرية

১৩১. গোসতাফ লে বোন-(Gustave Le Bon)। লে বোন ৭ মে ১৮৪১ সালে ফ্রান্সে তার জন্ম হয় ও ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে ফ্রান্সের মারনিয়াহ লাকোকিয়া শহরে মারা যান। পেশায় তিনি একজন ডাক্তার ও ইতিহাসবিদ। প্রাচ্যবিদদের মাঝে যারা ন্যায়-নীতিবান হিসাবে প্রসিদ্ধ, তিনি তাদের অন্যতম। তার রচিত অন্যতম গ্রন্থ হলো,

حضارة العرب وحضارات الهند (١٨٨٤) وحضارة العرب في الأندلس وسر تقدم الأمم وروح الاجتماع.

এছাড়া তিনি ফরাসি ভাষায় অসংখ্য বই রচনা করেন। তিনি অন্যতম প্রাচ্যবিদ, যিনি আরব জাতি ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির ন্যায়-সঙ্গত মতামত দিয়েছেন। লে বোনের মতে, 'মুসলিমগণ ইউরোপকে সভ্য বানিয়েছে'। কিন্তু অন্য অন্য ইউরোপিয়ানগণ তার এ মন্তব্যকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন।

পশ্চিমাদের লেখা এটাই সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ, যাতে ইসলাম ও তার সংস্কৃতির ব্যাপারে ইনসাফের প্রতি লক্ষ রেখে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে। গোসতাফ লোবুন একজন জড়বাদী দার্শনিক। তিনি কোন ধর্মমতে বিশ্বাস রাখেন না। এ কারণেই তিনি এমন মত প্রকাশ করেছেন। তার ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি ইনসাফ করার আরেকটি কারণ হলো, তিনি দ্ধধু পশ্চিমাদের মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি নির্ভর করেননি (বরং তিনি ইসলামি মৌলিক জ্ঞান কুরআন-হাদিস নির্ভর গবেষণা করেছেন)।

অবশ্যই তিনি ঊনবিংশ শতাব্দির অন্যমত একজন ঐতিহাসিক ও সমাজবিদ; তা সত্ত্বেও পশ্চিমা ও ইউরোপিয়ানগণ তার উপর আক্রমণ করেন, বিশেষকরে ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদগণ।

দুই. পশ্চিমারা বস্তুবাদী ও তাত্ত্বিক শক্তিকে আঠারো ও ঊনিশ শতকে অর্জন করেছে। এ কারণে তাদের জ্ঞানী-গুণী, ঐতিহাসিক ও লেখকদের একটি বড় অংশের অন্তরে প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা স্থান করে নিয়েছে। এমনকি তারা এখন বিশ্বাস করছে, (মুশরিকবাদে) ইতিহাসের সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল হলো পশ্চিমারা। আর পশ্চিমা বুদ্ধিমত্তা, মানসিকতা-ই হলো সূক্ষ্মদর্শিতা মানবতার পরিচায়ক, যা সঠিক গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম। এ ছাড়া অন্য যেসব জাতি ও তাদের চিন্তাধারা রয়েছে— বিশেষকরে ইসলাম তাদের মানসিকতা অতি সাধারণ ও সাদাসিধে। এর চেয়েও বেশি স্পষ্ট উক্তি করেছেন প্রাচ্যবিদ এইচ. এ. আর. গিব তার রচিত جهة الاسلام গ্রন্থে। তার বক্তব্যের সারকথা হলো, ইসলামি মানসিকতা সকল বিষয় উপলব্ধি করে আংশিক ও সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে; ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

ঔপনিবেশিকতার খড়্গ পরিচালিত জাতির উপর প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ জীর্ণ-শীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এ রকম উদ্ভট মন্তব্য করে থাকেন। কারণ পশ্চিমা ও ইউরোপিয়াগণ যাদের উপর নেতৃত্ব ও ঔপনিবেশিকতার স্টিমরোলার চালিয়েছেন সে সময় তারা ছিল জ্ঞানহীন অন্ধত্বের মাঝে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা ছিল পশ্চাতপদ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে আমাদের মিশ্রণ

বর্তমান শতাব্দিতে (ঊনিশ শতক) পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে আমাদের মিশ্রণ ঘটতে শুরু করেছে। আমাদের ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমান সময়ের এমন কোন সুসভ্য শিক্ষাবিদ পাওয়া যাবে না (ওলামায়ে কিরাম ব্যতীত) যাদের সম্মুখে আমাদের পুরাতন ধাঁচের গ্রন্থাবলি পথনির্দেশক রূপে রয়েছে। তবে অবশ্যই তাদের সম্মুখে রয়েছে ঐসব (ইহুদি-খ্রিস্টান) প্রাচ্যবিদদের লেখা গ্রন্থাবলি, যারা আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করার জন্য সাধারণ পাঠাগারগুলোর ভাণ্ডার থেকে উৎস অনুসন্ধান করতে আপন জীবন বিলীন করে দিয়েছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল দিক নিয়ে (কুরআন, হাদিস, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভূগোল, রাষ্ট্র প্রভৃতি) গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখতে জীবনের বিশটি বছর ব্যয় করেছেন। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের পুরাতন যত উৎসগ্রন্থ রয়েছে সবগুলোই তারা মুরাজায়াত (বারবার অধ্যয়ন) করেছেন।

তাদের বিজ্ঞজনদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, পূর্ণ সময় নির্ধারণ, ঔপনিবেশিকতার ধর্মীয় চেতনার প্রতি আগ্রহ তাদের এমন দীর্ঘ স্টাডি করতে বাধ্য করেছে। তারা সক্ষম হয়েছে আমাদের শিক্ষাবিদদের কাছে আমাদের ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সুবিন্যাস্ত করে উপস্থাপন করতে। সক্ষম হয়েছে আমাদের সু-সভ্যদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। বিশেষ করে যখন তারা আমাদের পুরনো গ্রন্থাবলির বিন্যাস ও প্রাচ্যবিদদের গবেষণা বিন্যাসের সাথে তুলনা করবে, তখন অবশ্যই তারা তাদের (প্রাচ্যবিদদের) জ্ঞান ও গবেষণার প্রশস্ততায় অভিভূত হয়ে প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থাবলির দিকে উদ্দীপ্ত ও তাড়িত হবে। এ ধারণা করবে যে, হ্যাঁ, তারা সত্যই বলেছেন। আর যেসব বিষয় তারা আমাদের ওলামায়ে কিরামের বিরোধিতা করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে তারা মনে করে প্রাচ্যবিদরাই সঠিক হুকুম দিয়েছেন। তাদের মতই সঠিক। কেননা, তারা অতি সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে এ পথে চলছেন। তারা অনিরপেক্ষও নন। এভাবেই ঐসব পাশ্চাত্য ও ইউরোপিয়ান গবেষকদের গবেষণামূলক আলোচনা দ্বারা নতুন জীবনধারা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মতামতের উপর আস্থাশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের শিক্ষাবিদ ও সুসভ্য ব্যক্তিবর্গ

পশ্চিমা গবেষক ও প্রাচ্যবিদেরা যেসব ইসলামি উৎস গ্রন্থগুলোর সহায়তায় অধ্যয়ন করেছেন— 'আলোচিত শিক্ষাবিদ', 'সুসভ্য ব্যক্তিদের' সেগুলো মুরাজায়াত (ইসলামের মৌলিক বাণী কুরআন, হাদিস ও ফিক্হ প্রভৃতি)। যেগুলোর সহায়তায় পূর্ববর্তী প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ গবেষণাপত্র-গ্রন্থ তৈরি করেছেন) করার সুযোগ তাদের হয়ে ওঠে না।

উল্লিখিত সময়ে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ইসলামি মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ থেকে বিমুখ হবার কিছু কারণ নিম্নরূপ—

১. হয়তোবা আমাদের উৎস গ্রন্থগুলো মুরাজায়াত করা দুঃসাধ্য হবার দরুন।

২. অথবা দ্রুত গবেষণার ফলাফল বের করতে আগ্রহী হবার কারণে।

৩. অথবা আমাদের দীন এবং ইলমি গবেষণার বিরোধিতা করার প্রবৃত্তিগত তাড়না পূরণের জন্য।

৪. আর পশ্চিমা গবেষকদের বিপরীতে অনির্ভরশীলতা দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের উপর এক নির্যাতনের স্টিমরোলার ও দখলদারিত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্যবিদদেরকে সম্মান করা, তাদেরকে বড় ভাবা, তাদের প্রতি সর্বদা সুধারণা রাখা প্রভৃতি এরই ধারাবাহিকতার নামান্তর।

যখন আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক চেতনার আন্দোলনের সূচনা হলো, পশ্চিমাদের কর্তৃত্ব হতে বের হয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক স্বকীয়তার প্রারম্ভ হলো, চিন্তা ও ভাবধারাগত স্বকীয়তার বীজ বপন হলো, তখন আমাদের কাছে গচ্ছিত পুরনো পাণ্ডুলিপি, আকিদা-বিশ্বাস ও আইন কানুন প্রভৃতির পরিচয় লাভের জন্য প্রাচ্যবিদদের উপর নির্ভর করা লজ্জা ও হতাশাজনক অবস্থান ছাড়া আর কিছুই না। দীনি ও গাইরে দীনি বিষয়– এই চেতনাবোধটি মধ্যপন্থী শিক্ষাবিদ ও সু-সভ্যদের মাঝে পৌঁছে গেছে। ফলে প্রকৃত বাস্তবতাকে আমরা উন্মোচিত করতে পারব। প্রাচ্যবিদগণের গবেষণা ও আলোচনার পিছনে তাদের দীনি ও ঔপনিবেশিক লক্ষ-উদ্দেশ্যের বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের

শক্তি-সামর্থ্য ও স্বকীয়তা পূর্ণতায় পৌছাবে না। কেননা, আল্লাহর নীতি সকল বস্তুর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম

কিন্তু আমরা তো এই পথে চলছি। প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ধোঁকা ও বিভ্রান্তি থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে সক্ষম হচ্ছি; কিন্তু এমন একদিন আসবে, যেদিন আমাদের সন্তান, নাতি, দৌহিত্ররা প্রাচ্যীয় ষড়যন্ত্রের মাঝে পুরোপুরি ফেঁসে যাবে। তখন তারা বলবে, কীভাবে আমরা ঐসকল প্রাচ্যবিদদের চক্রান্তে ধোঁকার জালে আবদ্ধ হলাম? এমন এক সময় আসছে, যেদিন আমরাই পশ্চিমাদের পাণ্ডুলিপি ও দীন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক তাদের পর্যালোচনার উপর ঝুঁকে পড়ব। সেদিন অচিরেই আসছে, যেদিন আমাদের সন্তানরা পশ্চিমাদের তৈরি করা পর্যালোচনার নীতিমালা অনুসরণ করবে। আকিদা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের পর্যালোচনাই ধর্তব্য ও মাপকাঠি হবে। তখন তা হবে অত্যন্ত সাংঘর্ষিক ও ভয়ংকর। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আকিদার সাথে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ বর্তমানে যা মিশ্রণ করেছে, ভবিষ্যতে তা আরো বেশি আপত্তিকর ও বিপদজনক হবে।

ভেবে দেখ, যদি মুসলিমগণ কুরআন-হাদিসের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদগণের ব্যবহার করা সমীক্ষা ও সমালোচনাকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করে, তবে তাদের কিতাব ও উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের শিক্ষা বাকি থাকতে পারে? প্রমাণ হিসাবেও বা কী অবশিষ্ট থাকল?

ভেবে দেখ, ভবিষ্যতে মুসলিমগণ যদি প্রাচ্যবিদগণের তথাকথিত গবেষণামূলক পর্যালোচনাকে আমাদের ইতিহাস, সভ্যতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য, ইমামদের পর্যালোচনা, পবিত্র বস্তুসমূহ, বিজয় সেনানীগণ, নেতা, নেতৃত্বদানকারীগণ ও আলেমগণ প্রমুখের ব্যাপারে মাপকাঠি বানায়, তা হলে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের আরো বেশি খারাপ ধারণা, বীতশ্রদ্ধাপূর্ণ ও সন্দেহ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তখন মুসলিম সভ্যতা পুরনো ঝলমলে কাপড়ে প্রকাশ পাবে (মানুষ তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে)।

সাবধান। এ সভ্যতার এক শ্রেণির আলেম, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সাহিত্যিক উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান আকৃতিতে প্রকাশ পাবে, যাদের মাঝে থাকবে না মান-মর্যাদা, উত্তম আদর্শ, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতা। আমি কামনা করছি না যে, আমাদের একটি অংশ এ সভ্যতা ও তার পুরোহিত-পাদ্রীদের সম্পর্কে হুবহু এই পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য অবসর সময় বের করবে, যেভাবে প্রাচ্যবিদগণ করে থাকেন। যেমন: অসম্পূর্ণ বর্ণনা অনুসন্ধান, কোনো একটি বিষয়কে তার বাস্তবতার বিপরীত বোঝা বুঝানো, ভালকে মন্দ দ্বারা বদলানো ও প্রত্যেক মঙ্গলজনক বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা প্রভৃতি। এগুলো সবই পাশ্চাত্য পাণ্ডিতদের থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। বিষয়টা যদি এমনই হয়, তবে এই সভ্যতা ও তার খ্যাতিমান ব্যক্তিদের এমন এক কুৎসিত অবয়ব প্রকাশ পাবে, যা সকলের পূর্বে প্রাচ্যবিদগণই এর প্রতিবাদ করবে।

তুমি কি আমাদের মাঝে এরকম কাউকে পাবে, যে এই কাজের জন্য প্রস্তুত হবে। প্রাচ্যবিদদের তৈরি করা নিজস্ব নীতিমালাতে তাদের সভ্যতা, আকিদা-বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাদের একটি বাস্তব রূপ তুলে ধরবে[১৩২]। এটা প্রাচ্যবিদগণ নিজেরাই শুধু পাঠ করবেন। (যদি প্রাচ্যবিদগণ তাদের তৈরি করা মূলনীতির আলোকে বের করা গবেষণা পত্র-গ্রন্থ গ্রহণে আগ্রহী না হন) তাহলে তারা আমাদের ইতিহাস ও ধর্মীয় চেতনার ব্যাপারে বাস্তবতার পরিচয় লাভের জন্য যে খিদমতের পন্থা অবলম্বন করেছিল তা কীভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের ধিক্কার জানাই, হতে পারে এরপর থেকে গবেষণার নামে ক্রমাগত বিভ্রান্তি ও বিকৃতি সাধন ও ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা হতে তারা বিরত থাকবেন।

---

১৩২. অর্থাৎ পশ্চিমাদের জীবনব্যবস্থা, ধর্ম ও সভ্যতার একটি বাস্তব রূপ তাদের তৈরী মূলনীতি দিয়ে বিশ্বাবাসীর কাছে পেশ করা হবে। এতে তারা যতটুকু মুসলিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য চেষ্টা করেছে তার থেকে হাজার গুণ তাদের অপকর্ম ও অসভ্যতা ফুটে উঠবে। যদি বাস্তব পর্যালোচনায় এমনটি উঠে আসে, তা হলে তাদের মত অসত্য ও ভ্রান্ত নীতিমালা অবলম্বন করলে কী অবস্থা দাঁড়াবে একবারও কি তারা ভেবে দেখেছে?

এখনই সময় স্বকীয়তা ও উন্নত চেতনা তৈরীর

আমি স্বীকার করি, আমরা এমন এক যুগ পার করেছি, যখন আমরা আমাদের ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় লাভ করার জন্য পশ্চিমাদের জ্ঞানকোষ ও তাদের অধ্যাপনার প্রতি নির্ভরশীল হলাম; অথচ আমাদের পূর্বপুরুষদের সংকলিত ও লিপিবদ্ধ গ্রন্থাবলি ছাড়া তাদের মৌলিক কোনো উৎসগ্রন্থ নেই। ইতিপূর্বে আমরা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। আর ধর্মীয় উৎসগ্রন্থের ব্যাপারে লজ্জাজনক অন্ধত্ব হতে আমাদের ললাটকে সু-উচ্চ করার এখনই সময়।

ধর্মীয় গ্রন্থাবলি বোঝা ও অধুনাবন করা, আরবিভাষা শিক্ষা, বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস উপলব্ধি ও ধর্মীয় আলেমদের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে পশ্চিমাদের জ্ঞান-বুঝের উপর নির্ভরশীল হওয়া অপমানজনক। বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদ ও পশ্চিমা গবেষকরা আশা করছেন আমরা যেন আমাদের দীন-ধর্ম, আলেম-ওলামাদের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় ও কুধারণার মধ্যে থাকি। আর এখনই উপযুক্ত সময় এসেছে আমরা সকল ধুলা-বালি ঝেড়ে ফেলে কাজ করতে থাকব এবং আমাদের গচ্ছিত গবেষণালব্ধ ধনভাণ্ডারগুলোর প্রচার-প্রসার করব। এর দ্বারা একটি স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, উন্নত চেতনা ও মন-মানসিকতা আমাদের মাঝে স্থান পাবে।

এরপরও যে ব্যক্তি আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও মতামতকে বিশ্বাস করে, সে যেন অতিরিক্ত বিশ্লেষণের জন্য আমার রচিত السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي গ্রন্থটি ও এ ধরনের আরো গ্রন্থ[১৩৩] অধ্যয়ন করে নেয়। উক্ত গ্রন্থে আমি প্রাচ্যবিদগণ ও তাদের সাথে আমার ও তাদের বিভিন্ন মতামত নিয়ে পর্যালোচনা করেছি, যা দ্বারা ঐসকল প্রাচ্যবিদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা প্রকাশ ও প্রকৃত গুপ্তরহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

---

১৩৩. এই বইয়ের ভূমিকায় পঁচিশটির বেশি পুস্তিকা ও গ্রন্থের আলোচনা করা হয়েছে। একই বিষয় প্রিয় শায়খ সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. 'আল-ইসলাম ওয়াল মুসতাশরিকুন' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে প্রাচ্যীয় পণ্ডিতদের কর্মতৎপরতার ব্যাপারে ধারণা উক্ত বইটিতে পাওয়া যাবে।

আমরা বিকৃতি সাধনকারী ও বিপথগামীতার পথপ্রদর্শকদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করব; তবে যেসব প্রাচ্যীয় পণ্ডিতগণ আমাদের পুরাতন মূল্যবান গ্রন্থগুলো প্রকাশের ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসাফের ভূমিকা পালন করেছেন এবং সত্যানুসন্ধানের গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তাদেরকে আমরা অবমূল্যায়ন করছি না। কারণ, ইসলামি জ্ঞান এমন নয় যে, তা থেকে এক শ্রেণির লোক এক চেটিয়া সুবিধা ভোগ করবে আর অন্য শ্রেণি বঞ্চিত হবে।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটা সম্ভব নয় যে, দীনের চিন্তা-চেতনা ও বুঝ দ্বারা শুধু নির্দিষ্ট সম্প্রদায় লাভবান হবে। এ আলোচনা হতে যে যতটুকু চায় যেন বুঝে নেয়। তবে (ইসলাম ও ইসলামি জীবনব্যবস্থার মৌলিক উৎস কুরআন-সুন্নাহ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য) শর্ত হলো, ইসলামিয়্যাত অধ্যয়নকারীকে প্রকৃত জ্ঞানীদের গুণাবলিতে সজ্জিত হতে হবে। আর তা হলো ন্যায়-নীতির দৃষ্টিভঙ্গি ও সত্যের প্রতি নির্ভেজাল একনিষ্ঠতা অর্জন করা; পাশাপাশি প্রকৃতির তাড়না, অবাধ্যতা ও অন্যায় আচরণ বর্জন করতে হবে।

সমাপ্ত